দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

নোটবন্দি সমাচার :
মোদীজীর
দুঃসাহসিক
মহাযজ্ঞ
পৃঃ - ১১

দেশপ্রেম জাগাতেই
দেশের সিনেমাহলে
জাতীয় সঙ্গীত
বাধ্যতামূলক
পৃঃ - ১৩

৬৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬।। ১০ পৌষ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত

- ছবি শুরুর আগে সব প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় সঙ্গীত
- সব দর্শকের উঠে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক
- জাতীয় সঙ্গীতের সময় পর্দায় দেখাতে হবে জাতীয় পতাকার ছবি
- জাতীয় সঙ্গীতের বাণিজ্যিক অপব্যবহার নয়

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ১০ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৬ ডিসেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : মেদ ঝরালেন দিদি, ওজন কমল না ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

‘নোটবন্দি’ সমাচার : মোদীজীর দুঃসাহসিক মহাযজ্ঞ ▯ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১১

দেশপ্রেম জাগাতেই দেশের সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৩

জাতীয় সঙ্গীতের কাহিনিটি কি আপনার জানা আছে? ▯ কাঞ্চন গুপ্ত ▯ ১৬

পল্লবরাজদের মন্দির ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ২১

আদিত্যরূপী বিষ্ণুর বিচরণ ▯ অমিত ঘোষদস্তিদার ▯ ২৩

বিমুদ্রাকরণ একটি সাহসী অর্থনৈতিক সংস্কার : অর্থনীতিতে অবশ্যই সুফল ফলবে ▯ প্রবীণ কৃষ্ণ, জগদীশ ভগবতী, সুরেশ সুন্দরেসন ▯ ২৭

মুসলমান তোষণই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অস্বাভাবিক জনস্ফীতির কারণ ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ২৯

কোচিংয়ের ফাঁদে ছাত্র-অভিভাবক ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২ জানুয়ারি ২০১৭

প্রকাশিত হবে ২ জানুয়ারি ২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিপ্লবী বৈষ্ণবসাধক শ্রীরামানুজাচার্য

ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীরামানুজাচার্য। আজ সহস্র বছর পরেও তাঁর মত ও পথ কোটি কোটি মানুষকে মুক্তির প্রেরণা দিয়ে চলেছে। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করেছেন ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, সুকেশ মণ্ডল প্রমুখ।

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সর্বত্র রাজনীতি কাম্য নহে

দেশের নিরাপত্তার ভার যাঁহাদের হাতে সেই সেনাবাহিনীকে রাজনীতির অঙ্গনে টানিয়া আনিবার ঘৃণ্য খেলা শুরু করিয়াছে দেশেরই কতিপয় রাজনৈতিক দল। কিছুদিন পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেনাবাহিনীর রুটিনমাফিক কাজকে সেনা 'তোলা তুলিতেছে' বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির এইরূপ মন্তব্য সেনাবাহিনীর মনোবলে আঘাত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান সেনাপ্রধান দলবীর সিং সুহাগের স্থানে বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে সেনাপ্রধান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছে। উল্লেখ্য, দলবীর সিং আগামী ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করিবেন। যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিয়াই প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রতিরক্ষা দপ্তরের সমরবিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিয়া রাওয়াতকে সেনাপ্রধান করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। সমরবিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন, বিপিন রাওয়াতের ভারত-চীন সীমান্তে 'লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল' এবং কাশ্মীর উপত্যকায় কাজ করিবার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। গত বৎসর মিয়ানমারে নাগাজঙ্গিদের ওপর এবং উরির ঘটনার পর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাওয়াতের। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হইয়া যাওয়া কংগ্রেস, সিপিএম ও সিপিআই দল এই নিয়োগ লইয়া রাজনীতির খেলায় মাতিয়াছে। সেনাবাহিনীর ন্যায় দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানকেও তাহারা রাজনীতির কাদা ছোঁড়াছুড়িতে কালিমালিপ্ত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল রাজনীতির কচকচানিতে বিন্দুমাত্রও টুটিয়া যায় নাই।

মেকি ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস দলের মুখপাত্র মনীশ তেওয়ারি এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত লইয়া রাজনীতি করিতে শুরু করিয়াছেন। সঙ্গে পোঁ ধরিয়াছেন সিপিআইয়ের ডি রাজা এবং সিপিএমের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, দুইজন যোগ্য সিনিয়র থাকা সত্ত্বেও কোনো অধস্তনকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা কেন? ইহাতে নাকি সেনাবাহিনীর গরিমা নষ্ট হইয়াছে। বস্তুত, মনীশ তেওয়ারির স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এইভাবেই লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এস বৈদ্যকে সেনাপ্রধান করিয়াছিলেন। বামপন্থীরা চিরকালই দেশের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করিলে তাহারা বলিয়াছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীই চীন আক্রমণ করিয়াছে। সেই ট্রাডিশন সমানে চলিয়াছে। দেশবাসীর নিশ্চয় স্মরণ রহিয়াছে, কিছুদিন পূর্বেই জে এন ইউ-তে দেশদ্রোহী আফজল গুরুর নামে জয়ধ্বনি দেওয়া ছাত্রদের উৎসাহ দিতে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও সিপিএমের প্রকাশ কারাত উপস্থিত ছিলেন। উরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনা যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করিয়া পাকিস্তানকে মুখের ওপর জবাব দিয়াছিল তখনও তাঁহারা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই এই বিষয়ে তাহাদের মন্তব্য পাকিস্তানকে খুশি করাইবার নামান্তর মাত্র। আসলে, সেনাপ্রধান নিয়োগের বিষয়ে রাজনীতি করিতে গিয়া তাহারা জাতীয় নিরাপত্তার ন্যায় স্পর্শকাতর দিকটির কথা ভাবিতেছেন না। তাহাদের নিকট দেশ বড় নহে, ক্ষমতার অলিন্দে থাকাটাই বড় কথা। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা আজ রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হইয়াছে বলিয়া নয়, চিরদিনই তাহারা দেশের স্পর্শকাতর দিকগুলি লইয়া রাজনীতির খেলা খেলিয়াছে। ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র যথার্থই বলিয়াছেন, সেনাবাহিনীকে লইয়া যাহারা রাজনীতি করেন তাহারা কি আদৌ দেশেপ্রেমিক?

সেনাপ্রধানের নিযুক্তির সিদ্ধান্ত একেবারেই কেন্দ্রীয় সরকারের। যোগ্য ব্যক্তিকেই এই পদে নিয়োগ করা দস্তুর। বিপিন রাওয়াতকে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত সরকারের সঠিক ভাবনার প্রতিফলন। কংগ্রেসের নিজের ঘর চলিতেছে অযোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া। সেইখানে চাটুকারদের পদ দেওয়া হয়। অযোগ্য ও চাটুকারদের পদ—ইহা কংগ্রেসের গর্ব হইতে পারে কিন্তু দেশের গর্ব হইল সেনাবাহিনী। তাহাদের লইয়া রাজনীতি করা দেশ বরদাস্ত করিবে না।

সুভাষিতম্

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো ন হি সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে।। (চাণক্যনীতি)

সব পর্বতে মণি-মাণিক্য পাওয়া যায় না, সব হাতির মাথা থেকে মণিমুক্তো পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে সর্বত্র সাধুপুরুষরা থাকেন না। তেমনি সব বনে চন্দনবৃক্ষ পাওয়া যায় না।

নবির জন্মদিনে ধর্মান্ধদের তাণ্ডবে আতঙ্কিত হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এবারই প্রথম নবির জন্মদিনে শোভাযাত্রা বের করেছিল বীরভূম জেলার মল্লারপুরের রুকুনপুর মসজিদ কমিটি। তা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তেজনা। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে উত্তেজিত জনতার ছোড়া পাথরে জখম হন বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে রয়েছেন রামপুরহাটের সার্কেল ইন্সপেক্টারও। এলাকার হিন্দুদের দোকানপাট বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ রবারবুলেট ব্যবহার করে। খবরে প্রকাশ, পুজোর আগে মহরমের চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র এই এলাকায় গণ্ডগোল হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ নবির জন্মদিনে শোভাযাত্রা বের করার অনুমতি দেওয়ায় আগে থেকেই এখানে উত্তেজনা ছিল। ঘটনার দিন রুকুনপুর, খরাসিনপুর প্রচন্দপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের চার-পাঁচ হাজার মানুষ হাজির হয়ে শোভাযাত্রা শুরু করে। মিছিল মল্লারপুর চৌমাথায় এলে প্রথম উত্তেজনা ছড়ায়। মিছিল থেকে কিছু মানুষ বেরিয়ে স্থানীয় হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এই সময় খরাসিনপুর গ্রাম থেকে অন্য একটি মিছিল মল্লারপুরের দিকে আসার চেষ্টা করলে বাহিনা মোড়ের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে হিন্দুরা বাধা দেয়। পুলিশ দুই পক্ষকেই সরিয়ে দেয়। কিন্তু দুপুরে খরাসিনপুরের মুসলমানেরা বাহিনা মোড়ে জমায়াতে হয়ে হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। পুলিশ বাধা দিলে পাথর ছোড়া হয়। জখম হন রামপুরহাটের সার্কেল ইন্সপেক্টর দেবদয়াল কুণ্ডু ও ময়ূরেশ্বর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার জীবন মণ্ডল। এরপরই পুলিশ রবারবুলেট চালায়। আহত হয় ১৩ বছরের বাদশা কলিমুদ্দিন নামে এক বিক্ষোভকারী কিশোর। অভিযোগ, ক্ষিপ্ত জনতা এরপর মল্লারপুর ফাঁড়িতে ভাঙচুর চালায়। পরের দিন মল্লারপুরে অঘোষিত বন্‌ধ পালিত হয়। বিকেল তিনটের পর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হলেও এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকে। দুই পক্ষই ঘটনার জন্য এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ রায়কে দায়ী করেছে। মল্লারপুরের আমজাদ আলি বলেন, 'বিধায়কের ভূমিকা ঠিক ছিল না।' শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়ার জন্য বিধায়ক পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন বলে অভিযোগ করেন হিন্দুরা। অন্যদিকে, হাওড়ার সাঁকরাইলে মিলাদের মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় একদল উন্মত্ত মুসলমান যুবক রাস্তার ধারে দোকানপাট এবং বাড়ি ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্ষতিগ্রস্তরা সকলেই হিন্দু। অভিযোগ, তথাকথিত ধর্মীয় মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই কয়েকজন বেপরোয়া যুবক ছাপার অযোগ্য ভাষায় স্থানীয় দোকানদারদের গালিগালাজ করতে থাকে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করলে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ধুলাগড়ে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হিন্দুদের ঘরবাড়ি।

সাঁকরাইল থেকে ধুলাগড়ি খুব দূরে নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ১৩ ডিসেম্বর সকালে পশ্চিমপাড়া দিয়ে জোর করে তাজিয়া নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবাসী আপত্তি জানায়। তাতেই মিছিলকারীরা হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগাতে শুরু করে। বোমাবাজি করে হিন্দুদের আতঙ্কিত করা হয়। ধুলাগড়ি দেওয়ানঘাটায় মহাপ্রভু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গৌতম প্রামাণিকের সেলুন, জয়দেব দাসের জুতো সেলাইয়ের দোকান, অসীম দাসের মুদিখানার দোকান ভাঙচুর ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া ও লুঠতরাজ করা হয়।

১৪ তারিখে আবার মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে এসে হিন্দুপাড়ায় বোমাবাজি করতে শুরু করে। সেখানে শিবতলা, দেওয়ানঘাটা এলাকার পরিস্থিতি এত খারাপ হয়ে পড়ে যে র‍্যাফ নামাতে হয়। এমনকী স্থানীয় হিন্দুরা ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলায় ৬নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এলাকায় শান্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

প্রশাসনের অবশ্য কোনো হেলদোল নেই। থাকার কথাও নয়। কিছুদিন আগে টিপুসুলতান মসজিদের ইমাম নুর রহমান বরকতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার ফতোয়া জারি করলেও রাজ্য সরকার একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির বাড়তি নিরাপত্তার কোনো দায়িত্ব নেয়নি। প্রতিবাদ আসেনি শাসকদলের পক্ষ থেকেও। অন্য বিরোধী দলগুলিও ঘোলা জলে মাছ ধরার আশায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আতঙ্কিত হিন্দুদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের জাতিশৃঙ্খলা ভেঙে রাজ্যটিকে মুসলমান প্রধান বানাতে চান, সেই কারণেই তিনি বরকতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাঁদের অনেকেরই প্রশ্ন, যে ইমাম বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মাথা কেটে নেওয়ার ফতোয়া জারি করেছিলেন, ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুতে স্বজনহারানোর ব্যথায় জেনাজার নমাজ পড়েছিলেন এবং সম্প্রতি দিলীপ ঘোষের মতো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে পাথর ছুড়ে হত্যা করার হুমকি দিলেন তাকে মমতা কোন যুক্তিতে সমর্থন করছেন?

কাশ্মীরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেনার ওপর হামলার ছক জঙ্গিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৭ ডিসেম্বর পাম্পোরে সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়ে তিন জওয়ানকে হত্যার ঘটনায় জঙ্গিদের পরিকল্পনায় বড়োসড় রদবদল টের পাচ্ছেন সমর-বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, বিগত কয়েকমাস যাবৎ বেশ কয়েকবার এরকম ঘটনা প্রমাণ করছে সীমান্তে গুলিবর্ষণ কিংবা অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে হামলার কৌশল বদলেছে জঙ্গিরা। তাদের বর্তমান লক্ষ্য জম্মু-কাশ্মীরের প্রান্তিক এলাকায় হামলা ও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজ্যজুড়ে অশান্তি, হিংসা ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এ বছরের ২৯ নভেম্বর নাগরোটায়। ওই সেখানকার সেনা-ছাউনিতে এলোপাথারি ভারী গুলিবর্ষণ করে ছয় সেনা জওয়ানকে হত্যা করা হয়। ইতিপূর্বে নাগরোটা আক্রমণের একমাস আগে থেকেই নিয়ন্ত্রণ রেখার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সংখ্যাধিক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীও পাল্টা গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে এর প্রত্যুত্তর দিত।

এরপরে সেনাবাহিনী তাদের পরিকল্পনায় কিছু বদল এনে সীমান্তবর্তী পাক সেনা-ছাউনি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। কারণ তারা নজর করেছিল যে জঙ্গিরা এই ছাউনিগুলিকে আড়াল করে কাশ্মীরে ঢুকতে চাইছে। ভারতীয় সেনার এই দাওয়াইয়ে রীতিমত কাজ হয়। পাক সেনার মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আই এস আই ও পাক-সেনার যৌথ পরিকল্পনায় দক্ষিণ-কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জঙ্গিরা হানাদারি শুরু করে। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ান ও আধিকারিকরা। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ ঘটাতেই পাম্পোর হামলা ঘটানো হয়েছে বলে সমর-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পক্ষ থেকেও জঙ্গি ও উগ্রপন্থা মোকাবিলায় পাল্টা কৌশল নেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হামলাকারী জঙ্গিদের দেখামাত্র নিকেশ করা এবং তারা যাতে পালাতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ও উত্তর কাশ্মীরে এই মুহূর্তে প্রবল কুয়াশার কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজে প্রভূত অসুবিধা হচ্ছে এবং অন্তত দুশো জঙ্গি এই এলাকায় লুকিয়ে থেকে আগামীদিনে পাম্পোরের মতো ঘটনা ঘটাতে চাইবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত দশদিনে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সাতটি এনকাউন্টার ঘটিয়েছে ভারতীয় সেনা।

আশা করা হচ্ছে যে জঙ্গি নাশকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবার 'উষ্ণ শীতকাল'-এর সাক্ষী থাকবে কাশ্মীর।

সদ্য প্রাক্তন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল রাহিল শরিফের থেকে দায়িত্ব হাতে নিয়েই নয়া পাক সেনাপ্রধান জাভেদ বাজওয়া একদিকে বলেছেন সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা হবে, অন্যদিকে আবার তিনিই প্রস্তাব নিয়ে ভারতের ভুল হিসাবের জন্য পরিস্থিতি মারাত্মক হতে পারে বলে হুমকি দিয়ে রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান বুঝিয়ে দিয়েছে কাশ্মীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা তো দূরে থাকুক, বরং আরও অশান্তি ছড়ানোই তাদের লক্ষ্য। আগামীদিনে ভারতের নতুন সেনাপ্রধান হতে চলেছেন বিপিন রাওয়াত। তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও কিছু সংবাদমাধ্যম যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তাতে এদেশে পাকিস্তানের বন্ধুর অভাব হবে না বলেই কূটনীতিকরা মনে করছেন। বাইরে শত্রুর আগে ঘরের শত্রুদের মোকাবিলা করাই মোদী সরকারের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

পার্টি ফান্ডে ২০০০ টাকার বেশি চাঁদা বন্ধের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজনৈতিক দলগুলোর কোটি কোটি টাকা অনুদান আদায়ে এবার লাগাম পরানোর সুপারিশ করল নির্বাচন কমিশন। এতদিন রাজনৈতিক দলগুলো ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেনামি অনুদান আদায় করতে পারত। নির্বাচন কমিশন তা ২০০০ টাকায় নামিয়ে আনার সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশ যদি কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ২০০০ টাকা বা তার বেশি বেনামি অনুদান গ্রহণ করলেই রাজনৈতিক দলগুলোকে দাতার নাম প্রকাশ্যে প্রতিটি অনুদানের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট রাখা এবং সেইসব অ্যাকাউন্টের অডিট করানোর কথাও চলেছে। অডিট রিপোর্ট পেশ করতে হবে বছরে একবার। সুপারিশ কার্যকর করতে জনপ্রতিনিধি আইন ১৯৫১-র প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছে নির্বাচন কমিশন। আপাতত নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখছে ল কমিশন। নির্বাচন কমিশন চায় যেসব রাজনৈতিক দল লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং কমপক্ষে কিছু আসনে জয়লাভ করে তাদেরই আয় করে ছাড় দেওয়া হোক। নয়তো সারাদেশ যখন কালোটাকা মুক্ত স্বচ্ছ অর্থনীতির জন্য মুখ বুজে লড়াই করছে, স্রেফ কয়েকটা অসৎ রাজনৈতিক দলের জন্য তা অধরাই থেকে যাবে।

তামিলনাড়ুতে শারিয়া আদালত নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অভিযোগ আগে থেকেই ছিল। সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্ট একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানির শেষে তামিলনাড়ুতে শারিয়া আদালত নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদের চৌহদ্দিতে গড়ে ওঠা আদালতগুলি অনেকদিন ধরেই জোর করে 'তিন তালাক' বলতে বাধ্য করা সহ নানারকম বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্প্রতি সৌদি আরবে কর্মরত আবদুল রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। আবদুল রহমান পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। অভিযোগ, তামিলনাড়ুর একটি বেআইনি শারিয়া আদালত তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী এ সিরাজুদ্দিন বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৈরি হওয়া কিছু সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য আবদুল রহমান শারিয়া আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতের হস্তক্ষেপে নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিচারকেরা প্রথমে জোর করে তাঁর কাছ থেকে সম্মতিপত্র আদায় করে নেয় তারপর নিজেরাই তিনবার তালাক উচ্চারণ করে বিয়ে ভেঙে দেয়। পুলিশকে বলেও কোনো লাভ হয়নি। তাই আমরা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছি।'

সূত্রের খবরে প্রকাশ, অভিযুক্ত শারিয়া আদালত, মক্কা মসজিদ শারিয়ত কাউন্সিল দীর্ঘদিন ধরেই বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ বাউল এবং এম সুন্দরকে নিয়ে গঠিত যৌথ বেঞ্চ অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত বেআইনি শারিয়া আদালত বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এই সব আদালতের জন্য 'সাধারণ মুসলমান মহিলাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে উঠছে' বলে আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

৭২টি কয়লাখনির অবস্থা খতিয়ে দেখার কেন্দ্রীয় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউপিএ সরকারের আমলে যে সব কয়লাখনি এনটিপিসি, জে এস ডব্লিউ স্টিল, হিনডালকো এবং সেইলকে বিতরণ করা হয়েছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছিল সেরকম ৭২টি কয়লাখনির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। কয়েকদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। কয়লামন্ত্রকের যুগ্ম-সচিবের সভাপতিত্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন। দু'দিনের বৈঠকের প্রথম দিনে হিনডালকো ইনড্রাসট্রিজ, ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড, এনটিপিসি, স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডকে বিতরণ করা ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের ৩৫টি কয়লাখনির অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। দ্বিতীয় দিনে হবে রিলায়েন্স সিমেন্ট, অলট্রাটেক সিমেন্ট, জিএসআর ছত্তিশগড় এনার্জি লিমিটেডকে বিতরিত বাকি ৩৭টি কয়লাখনিগুলির পর্যালোচনা।

এই খনিগুলি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশায় অবস্থিত। মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন বিতরণ এবং নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তরিত ৮৩টি কয়লাখনি থেকে কেন্দ্রীয় রাজস্বের পরিমাণ এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৭৭৯ কোটি টাকা। এই টাকার পুরোটাই খনিসংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউপিএ সরকার কয়লাখনিগুলি অ্যাডহক ভিত্তিতে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে এবং নিলামের প্রক্রিয়া শুরু করতে বলে।

কংগ্রেস ধরাশায়ী, চণ্ডীগড় পুরসভা বিজেপি জোটের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসকে শুইয়ে দিয়ে বিজেপি ও শিরোমণি অকালি দলের জোট চণ্ডীগড় পুরসভার ক্ষমতা দখল করল। ২৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি জোট পেয়েছে ২১টি আসন। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৪টি। উল্লেখ্য, চণ্ডীগড় পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি ২১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আর অকালি দল ৪টি আসনে। কংগ্রেসের তারকা প্রার্থীরা সকলেই প্রায় ধরাশায়ী হয়েছেন। সাম্প্রতিক নোট বাতিল বিতর্কে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং মিডিয়ার একাংশ সেখানে বিজেপির প্রতি মানুষের উত্তুঙ্গ রোষের খবর প্রচারে ব্যস্ত সেখানে বিপুল জয় একটি বিশেষ দিক্‌দর্শন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ব্রিটেনকে ছাপিয়ে গেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুপারনেশন হওয়ার লক্ষ্যে ভারত আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। দেশীয় অর্থনীতির আয়তনের বিচারে এবার ভারত ছাপিয়ে গেল খোদ ব্রিটেনকে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্রিকা ফোর্বসের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, গত ২৫ বছরে ভারতের আর্থিক বিকাশ বিশ্বের মধ্যে দ্রুততম। অন্যদিকে, ইউরোপ জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা-সহ নানা কারণে গত এক বছরে ব্রিটেনের অগ্রগতি অনেকটাই স্তিমিত। এই কারণেই ব্রিটেনকে পিছনে ভারতের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে বলে সমীক্ষকদের ধারণা। আগে মনে করা হোত ২০২০ সাল নাগাদ আর্থিক বিকাশের নিরিখে ভারত ব্রিটেনকে ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকবার পাউন্ডের দাম বিপজ্জনক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় ভারত অনেক আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেল। সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কারণ ভারতের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি যেখানে ৬ থেকে ৮ শতাংশ সেখানে ব্রিটেনের বৃদ্ধি ১ থেকে ২ শতাংশ। ভারতের এমন একটি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'জিডিপি-র বিচারে ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের পঞ্চম রাষ্ট্র। আমেরিকা, চীন, জাপান এবং জার্মানির পরেই।'

ভারতের প্রথম ক্যাশলেস গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥

মধ্যপ্রদেশের বদঝিরি গ্রাম আর কিছুদিনের মধ্যে ভারতের প্রথম ক্যাশলেস গ্রাম হতে চলেছে। গ্রামের প্রায় দোকানেই এসে গেছে পয়েন্ট অব সেল (পিওএস) মেশিন। মধ্যপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত সালাইয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বদঝিরিকে ভারতের প্রথম ক্যাশলেস গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসেছে।’ তিনি আরও জানিয়েছেন ওই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই গ্রামের দোকানদারেরা নিজ নিজ দোকানে পিওএস মেশিন বসিয়েছেন। গ্রামের মোড়ে মোড়ে কিওস্ক নির্মাণ করে নগদহীন অর্থনীতির নিয়মকানুন সম্বন্ধে অবহিত করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকারও।

উবাচ

“বিশ্বকে ভারত অনেক কিছু দিয়েছে। তবে সেরা উপহার হলো ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবনা। বস্তুত আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত হলো পথিকৃৎ। এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দর মতো অবতার ও চিন্তানায়কদের জীবনে।”

প্রণব মুখোপাধ্যায়
রাষ্ট্রপতি

কর্মজগতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব প্রসঙ্গে।

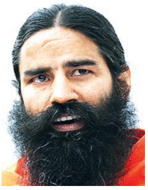

“মোদী সরকার নোটবন্দি করে খুবই ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সততার সঙ্গে তা সমর্থন করেনি।”

লখ্‌নউয়ে আয়োজিত ‘থিঙ্ক উইথ মি’ সম্মেলনে নোটবন্দি প্রসঙ্গে।

যোগগুরু বাবা রামদেব

“বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর এক অর্থহীন বিজয়দিবস পালন করলো। আশা ছিল যে, বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু এতে ঢাকা ব্যর্থ হয়েছে। এখন ওটা একটি মিনি পাকিস্তানের মতো।”

তসলিমা নাসরিন
প্রখ্যাত বাংলাদেশি লেখিকা

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে।

“ভারতের বামপন্থীরা সমস্ত রকমের সমাজবাদী ভাবনা ও সিদ্ধান্ত বর্জন করে ফেলেছে। এখন তাদের কাছে কেবলমাত্র একটি কাজ ও ভাবনাই অবশিষ্ট রয়েছে। আর তা হলো আর এস এসের বিরোধিতা করা।”

ড. রাকেশ সিনহা
দিল্লি ইউনিভারসিটির প্রফেসর

ভারতীয় কমিউনিস্টদের আরআরএস বিরোধিতা প্রসঙ্গে।

মেদ ঝরালেন দিদি, ওজন কমল না

পাঠক-পাঠিকা,

শীতের শুভেচ্ছা। এই তো ভালমন্দ খাওয়া দাওয়ার সময়। কিন্তু তাতে আবার ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়! কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, শুধু খাওয়া কমালেই ওজন কমে না, মেদ ঝরে না।

মেদ ঝরানোর প্রশংসনীয় সেই কাজটিতেই হাত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য প্রশাসনে দপ্তর কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে ছিল ৬৩টি দপ্তর। এখন সংখ্যা কমিয়ে ৫২। বস্তুত, প্রশাসন যত ছোট হয়, কাজের গতিও তত বৃদ্ধি পায়। ফলে, আশা করা যায়, আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ সরকারের কাজে গতি আনবে। কিন্তু সেখানেও দরকার সদিচ্ছা।

কিন্তু সদিচ্ছা যে নেই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন দিদি। এ নিয়ে বিভিন্ন স্তর থেকে নানা প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠতেও শুরু করেছে। মেদ ঝরাতে গেলে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। লোভ বর্জন করতে হয়। বহু পছন্দের জিনিসও চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়। প্রশাসনের মেদ কমানোর ক্ষেত্রেও কথাগুলি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার দপ্তরের সংখ্যা কমালেও মন্ত্রীর সংখ্যা কমিয়ে উঠতে পারেনি। সন্দেহ নেই, কাজটি বেশ কঠিন। এতদিন যাঁদের কাঁধে মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল, রাতারাতি তাঁদের ছেঁটে ফেলা মোটেই সহজ কথা নয়। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, মন্ত্রীর সংখ্যা না কমালে সংস্কারের মূল ভাবনাটিই বাস্তবায়িত হবে না। যে কারণে দপ্তর কমানো হচ্ছে, সেই একই কারণে মন্ত্রীর সংখ্যাও কমানো দরকার। নইলে প্রশাসনিক কাজে গতি আসবে না। প্রশাসনিক সংস্কারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দপ্তর এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত মন্ত্রীর পরিবর্তন প্রয়োজন। নইলে উদ্যোগটি তার গুরুত্ব হারায়। কিন্তু দিদির উপায় নেই। কোন ভাইকে কাছে টানবেন, কাকে দূরে সরাবেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। সেটা একমাত্র সদিচ্ছা থাকলেই সম্ভব। কিন্তু সেটারই যে বড় অভাব।

সব কাজ গায়ের জোরে হয় না। তবে সদিচ্ছা থাকলে গায়ের জোর ছাড়াও কাজ করা যায়। প্রশাসনের মতো কলকাতা শহরের রাস্তার মেদও তাই ঝরে না। ১৯৯৬ সালের 'অপারেশন সানশাইন'-এর মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে শ্যামবাজারে হকার উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। সেজন্য যথেষ্ট সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন। কারণ, কলকাতার অন্যত্র তিনি সাহস করেননি। আসলে ওই অভিযানে রাজনৈতিক কৌশল যতটা ছিল ততটা সদিচ্ছা ছিল না। পরে কলকাতার মেয়র হয়ে বর্তমানের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও চেষ্টা করেছিলেন ফুটপাথ খালি করে পথচারীদের চলাচলের সুবিধা করে দিতে। চেষ্টাই সার। শেষপর্যন্ত কোনো প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কলকাতাকে আধুনিক করতে চায়। দিকে দিকে সৌন্দর্যায়নের ধুম। সাধু উদ্যোগ। কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে যে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত, সে কথা মাথায় রাখা হয় না। কলকাতার ফুটপাথ সেই কবেই চুরি হয়ে গিয়েছে। এখানে ফুটপাথে বসে হকার। মানুষ হাঁটেন রাস্তায়। আর অষ্টপ্রহর হর্ন বাজিয়ে গাড়ি চলে মানুষের সঙ্গে লড়াই করে। পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক শহরে হর্ন বাজানো কার্যত অপরাধ। আন্তর্জাতিক ট্র্যাফিক আইন অনুযায়ী, রাস্তায় পথচারীর অধিকার প্রথম। তারপর গাড়ির। ফলে পথচারী রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়িকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। সভ্য দেশের এমন দস্তুর অবশ্য কলকাতায় খাটে না। কারণ, সভ্য দেশের মতো এখানকার মানুষ ফুটপাথ ব্যবহারের সুযোগ পান না। ফলে দু'লেনের হাতিবাগান, আড়াই লেনের গড়িয়াহাটে রাস্তার উপর মানুষ-গাড়ির কুস্তি চলে। এর একটিই সুরাহা। নাগরিককে ফুটপাথের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। বেআইনি দোকান উচ্ছেদ করা। এবং প্রয়োজনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। একদা এ শহরের মন্ত্রী-মেয়রেরা যা বুঝেছিলেন।

তাই বলে কি হকার থাকবে না? সভ্য দেশে রাস্তায় হকার বসেন। তবে তাঁদের বসার জায়গা এবং সময় নির্দিষ্ট। কোনোভাবেই হকারেরা ফুটপাথে স্থায়ী কাঠামো তৈরি করতে পারেন না। বস্তুত, সেখানে বিষয়টি উল্টো। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্যই ফুটপাথের উপর দোকানের ব্যবস্থা। ফলে হকারের জন্য পথচারীর ফুটপাথের অধিকার লঙ্ঘিত হয় না। ভারতের অন্যান্য মেট্রো শহরেও হকার সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হয়েছে। কিন্তু কলকাতার সংস্কৃতিতেই যে পিছিয়ে থাকার বিপ্লব! ভোটসর্বস্ব স্থিতিশীলতা! এ শহর আধুনিক হতে চায় না! এ রাজ্যের শাসকের রং বদলায়, ঢং বদলায় না।

—সুন্দর মৌলিক

‘নোটবন্দি’ সমাচার : মোদীজীর দুঃসাহসিক মহাযজ্ঞ

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ৮ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা করেন। তারপর বিগত মাসখানেক ধরে সমগ্র দেশে হৈচৈ পড়ে যায়। বিরোধীরা তারস্বরে নরেন্দ্র মোদীর মুণ্ডুপাত করতে শুরু করে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বিরোধীদের কলরবে বানচাল হয়ে গেল। জনপ্রতিনিধিরা মিছিল, মিটিং, অবরোধ, এমনকী বন্‌ধের পথে হাঁটলেন। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে বলতে হলো পার্লামেন্টের কাজকর্ম ভণ্ডুল করা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বিরোধী। সংসদ ভবনের সামনে ধরনার হুজুগে সংসদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়ে গেল। যদি মোদীজী এমন না করতেন তাহলে বিরোধীরা বলতেন তিনি কালোটাকার বিরুদ্ধে কিছুই করছেন না। ইউপিএ সরকারের আমলে কালোটাকার ভয়াবহ স্ফীতি ভুলে গিয়ে বিরোধী দলগুলির নেতা নেত্রীরা কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম শুধু বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি স্পষ্টতই পাঁচশো ও হাজার টাকার বিমুদ্রাকরণের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু দিল্লি থেকে পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এখন নৈরাজ্যের কালো মেঘ জমেছে। সাধারণ মানুষের সাময়িক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে চতুর পেশাদারি রাজনীতিবিদরা মোদীজীকে শয়তানের সমতুল বলে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

কিন্তু মোদীজী দৃঢ় সঙ্কল্প চিত্ত। তিনি যে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ভবিষ্যতে ভারতবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। এই সেই মোদী যাঁকে গোধরাকাণ্ডের পর ২০০২ সাল থেকে ‘মৃত্যুর সওদাগর’ বলে রাজনীতিবিদ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও বেশিরভাগ মিডিয়া ধিক্কার জানিয়েছিল। মোদীর বিরুদ্ধে যিনি সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন সেই তিস্তা শিতলবাদের এনজিও কালোটাকার অনুদানে কলঙ্কিত।

এবার আমি মোদীজীর নোট বিলগ্নিকরণ সিদ্ধান্ত কেন স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী পদক্ষেপ তা নিয়ে আলোচনা করব। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক সমস্ত ধরনের সমস্যার মূল ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর চরিত্র। স্বাধীনতার পূর্বে চলেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ। দাদাভাই নওরোজীর মতো প্রাজ্ঞ নেতা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অব্রিটিশ চরিত্রের সমার্থক বলেছেন। ভারতের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক শোষণ আর তার সঙ্গে রয়েছে প্রশাসনের অনৈতিক আচরণ। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও অসহনীয় নৈতিক স্খলন (Economic Poverty and moral poverty) ছিল একে অন্যের সহযাত্রী।

আর স্বাধীনতার পর কী দেখলাম? দেখলাম রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। পরিকল্পিত অর্থনীতির রাজসূয়যজ্ঞ। বড় বড় কলকারখানার আয়োজন হলো। কৃষি অর্থনীতি মার খেল। দুর্নীতির বোঝা বৃদ্ধি পেল। লাইসেন্স পারমিট রাজের দাপট বাড়ল। ১৯৭০-এর দশকে শুরু থেকেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠল। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই হাজার টাকার নোট বাতিল করলেন। এরপর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উপর লাগাম টেনে ১৯৯১ সালে বাজার অর্থনীতির পথে হাঁটা শুরু হলো। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির বেহাল দশা কাটল না। দুর্নীতি ও কালোটাকার স্ফীতি অর্থনীতির উপর আঘাত হানল। বিগত ইউপিএ

সরকারের আমলে কয়লা কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ গেমসের দুর্নীতি ও অগাস্তা কেলেঙ্কারি সামনে উঠে এল। রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র ও অসাধু কারবারিদের অশুভ আঁতাত দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। এদিকে দেশে বহুদলীয় জোট সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলো। কালোটাকার ভয়াবহ ব্যাপ্তির সঙ্গে শুরু হলো উগ্রপন্থী তাণ্ডব। কালোটাকার একটা অংশ দেশ-বিরোধী কাজে নিয়োজিত হলো। আর চলতে লাগল জালনোটের কারবার। ভারতীয় অর্থনীতিকে নাজেহাল করার জন্য উগ্রপন্থীরা জালনোটের কারবারে মেতে উঠল।

'যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে' :

দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে বরাভয় মন্ত্র নিয়ে হাজির হলেন নরেন্দ্র দামোদর মোদী। জোটবদ্ধ সরকারের ক্ষত নিবারণ করে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে মোদীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি একাই লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতাসীন হলো। স্থায়িত্ব এল, কিন্তু অর্থনীতির ক্যানসার নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন বড় ধরনের শল্য চিকিৎসা। ইসলামি মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের নাশকতার বিরুদ্ধে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর দাওয়াই দেওয়ার পরেই কালোধনের বিষবাষ্পে আবৃত ভারতীয় অর্থনীতির আবর্জনা সাফ করার দিকে নজর পড়ল। ৮ নভেম্বরের ঘোষণা বুঝি বিপ্লবের সমতুল। এটি কোনো সরকারি ঘোষণা নয়, এ যুদ্ধের রণভেরী। ধর্মযুদ্ধের হুঙ্কার, যার বিরুদ্ধে বিরোধীরা ধিক্কার ও আক্রোশের প্রতিরোধ ঘোষণা করেছেন। নরেন্দ্র মোদী বিষয়টিকে সঙ্গতভাবেই যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্যাধি নির্মূলের জন্য মহাযজ্ঞ একমাত্র পথ।

তারপর একমাস অতিক্রান্ত। মিডিয়া জগৎ এখন চুলচেরা বিশ্লেষণে নিমগ্ন। কী পেলাম আর কী হারালাম তার হিসেব নিকেশ চলছে। বিরোধীরা সংসদের মর্যাদা কলঙ্কিত করে চলেছেন। অর্থই অনর্থের মূল। কায়েমি স্বার্থের তল্পিবাহী রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ বলছেন নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত বাতিল করো। তাহলে আমাদের সঙ্গীসাথিদের মুশকিল আসান মিলবে। আবার কেউ বলছেন সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে মোদী এমন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত এড়াতে পারতেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া নিয়ে যে সব কর্মসূচি নিয়েছেন সেগুলি নিয়েও বিরোধীরা তারস্বরে প্রতিবাদ করছেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী 'পে. টি. এম'-কে 'পে টু মোদী' বলে বিদ্রূপ করেছেন। বিরোধীরা এখন জনগণের দুঃখ দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে উঠছেন। কিন্তু হাওলা, গাওলা, কয়লা বণ্টন, টুজি স্পেকট্রাম কাণ্ডে পুকুরচুরি করার সময় তাঁরা কি জনগণের কথা ভেবেছিলেন? কথায় বলে চোরের মায়ের বড় গলা! কালোটাকার সেবাদাসরা এখন গরিব মানুষের স্বঘোষিত অভিভাবক মেনেছেন।

মোদীজী পঞ্চাশ দিন সময় চেয়েছেন। হয়তো মাস দুইয়ের বেশি সময় না পেরোলে পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক হবে না। বোধ করি, প্রতিপক্ষরা পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হলেই 'আন্দোলন' প্রবল গতিতে শুরু করবেন। সংসদের বাজেট অধিবেশনের সময় আবার তরজার আসর বসবে সংসদের সভাকক্ষে। বিগত সত্তর বছরের এত্তা জঞ্জাল সাফ করতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু সাফাইয়ের কাজকর্ম যেন শেষ না হয় সে বিষয়ে বিরোধীরা সদাসতর্ক। উগ্রপন্থী তাণ্ডবকে যাঁরা নির্মূল করতে চান না, তাঁরাই ওই কালোটাকার নিধন চাইছেন না। জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা তাদের কাম্য নয়। উদারনৈতিক ও বাম ঘরানার লোকেরা বেশি মুষড়ে পড়েছেন। কিন্তু সঠিক উদারনৈতিকতা ও সমতার মতাদর্শে গোঁড়ামির স্থান নেই।

এখন ভারতবাসী চরম পরীক্ষার সম্মুখীন। 'করব না হয় মরবো' (Do or Die) সংগ্রামের অধিনায়ক নরেন্দ্র মোদী। তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা সন্দেহাতীত। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, স্তূপীকৃত কালোটাকার অর্থনীতির নাগপাশ থেকে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে রক্ষার জন্য তাঁর সংগ্রামী অভিযান বানচাল করতে চাইছে দেশেরই সুবিধাভোগী কায়েমি স্বার্থের সেবাদাসবৃন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান আক্রমণে যখন ব্রিটেন বিধ্বস্ত সে সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ব্রিটেনের সংসদে বলেছিলেন দেশবাসীর কাছে— আমার দেওয়ার কিছু নেই, আছে 'রক্ত, অশ্রুপাত আর ঘর্ম' (blood, tears and sweat)। ৪ঠা জুন ব্রিটিশ সংসদে ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো, পাহাড় পর্বতে, শস্যক্ষেত্রে রাস্তায় সর্বত্র লড়াই করবো। কিন্তু নতিস্বীকার করবো না।' সর্বাত্মক প্রতিরোধ সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্দীপিত করে তিনি জানালেন— 'ব্রিটিশ জাতির কাছে এখন সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় উপস্থিত (their finest hour)।' ভারতবাসী কি ক্লেশ ও ভোগান্তির মধ্যে সোনালি সময়ের জন্য দিন গুনছেন?

(লেখক ইতিহাসবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভ-এর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

দেশপ্রেম জাগাতেই দেশের সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক

ধর্মানন্দ দেব

রাষ্ট্রের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও প্রতীক হিসাবে সেই দেশের বা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, অস্তিত্ব, মর্যাদা, আদর্শ ও দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে জাতীয় সঙ্গীত। ডাচ জাতীয় সঙ্গীত 'ভিলহেলমাস'কে সবচাইতে পুরাতন জাতীয় সঙ্গীত বলা হয়। যদিও সরকারি ভাবে তা স্বীকৃতি পায় জাপানের জাতীয় সঙ্গীতের পরে। জাপানের জাতীয় সঙ্গীত 'কিমি গা ইয়ো' ১৮৮০ সালে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তৎসম বাংলাভাষায় রচিত গানটির সঠিক রচনাকাল জানা না গেলেও ১৯১১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রারম্ভে এই গানটি গাওয়া হয়েছিল। ১৯৩৭ সালেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে প্রথম 'জনগণমন' গানটির নাম প্রস্তাব করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৭ সালের ২৮ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই গানকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালের ৫ জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। সেই দুই দিন 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে প্রথম গাওয়া হয়। আর ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ মৌডক রণক্ষেত্রে জয়লাভ করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে, সেই দিন প্রথম ভারতের মাটিতে জনগণমন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বাজানো হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কাছে কোনো এক অনুষ্ঠানে বাজানোর জন্য ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের একটি রেকর্ড চাওয়া হলে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভারত সরকারকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং জনগণমন বাজানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পরে সরকারের অনুমোদনক্রমে জাতিসঙ্ঘে একটি গ্রামোফোন রেকর্ড সেই অনুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে বাজানো হয়। জওহরলাল নেহরু পরে বলেছিলেন, এই গানের সুর সেদিন সবার দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই

সুরটির স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে এর স্বরলিপি চান। কিন্তু ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন নিয়ে দেশে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। কেউ কেউ 'বন্দে মাতরম্'-কে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন, আবার কেউ কেউ 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বাস্তবে শুধুমাত্র মুসলমান বিরোধিতার জন্য 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচন করা হয়নি। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছিল এই গানটিতে নাকি দশভুজা দুর্গাকে দেশমাতা এবং শক্তির প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের পৌরোহিত্যে সংবিধান সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সভায় সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, ''জনগণমন' নামে পরিচিত গানটি কথা ও সুরসহ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে সরকারিভাবে গীত হবে। কোনো নির্দিষ্ট কারণ উপস্থিত হলে সরকার এই গানের কথায় যে-কোনো রকম পরিবর্তন আনতে পারবেন। 'বন্দে মাতরম্' গানটি যেহেতু ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী, তাই এটিও জনগণমন-র সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে।" গণপরিষদে সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ স্পষ্ট বলেন : ''The composition consisting of the words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India... and the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it."। সেই সভায় মৌলনা আবুল কালাম আজাদ-সহ অন্য মুসলমান সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। পরে দেশের কেন্দ্র সরকার ১৯৭১ সালে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা অবমাননারোধে সংসদে দু'টি আইন পাশ করে যথাক্রমে— Emblem and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1971 এবং National Honour Act, 1971। তবুও দেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা অবমাননা নিয়ে বেশ কয়েকবার বিতর্ক দেখা দেয়। সেই বিতর্ক দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত একাধিকবার গড়ায়।

২০১৬ সালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার তথা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার শ্যামনারায়ণ চৌসকি Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 কীভাবে সমগ্র দেশে লঙ্ঘন হচ্ছে তা তুলে ধরে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। মামলাকারী শ্যামনারায়ণ চৌসকি জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা নিয়ে এইবারই যে প্রথম আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তা নয়, ২০০৩ সালে করণ জোহরের নির্দেশনায় 'কভি খুশি কভি গম' সিনেমায় জাতীয় সঙ্গীতকে অবমাননা করা হয়েছে জানিয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশ-হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ২০০৩ সালের ২৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় প্রদানের সময় বিচারপতি ছিলেন দীপক মিশ্র, যিনি সুপ্রিমকোর্টের ৩০ নভেম্বরের অগ্রিম নির্দেশের বিচারপতি। সুপ্রিমকোর্টের ৩০ নভেম্বরের মামলার নম্বর ছিল রিট পিটিশন (সিভিল) নম্বর ৮৫৫/২০১৬। শ্যামনারায়ণ চৌসকি ওই পিটিশনে উল্লেখ করেন কেমন করে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা করা হচ্ছে এবং অপব্যবহার করা হচ্ছে। গত ২৮ অক্টোবর আবেদনকারী শ্যামনারায়ণ চৌসকির হয়ে আদালতে সওয়াল করে আইনজীবী অভিনব শ্রীবাস্তব জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননারোধে পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। সেই প্রস্তাবগুলি হচ্ছে— (১) আর্থিক বা অন্য কোনো মুনাফা লাভের জন্য জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বাণিজ্যিকরণ না করা। (২) জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি না করা এবং কোনো অবস্থাতেই জাতীয় সঙ্গীত সংক্ষিপ্তভাবে পাঠ না করা। (৩) জাতীয় সঙ্গীত কোনো ভাবেই নাটকীয় ভাবে পেশ না করা এবং কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে না গাওয়া। (৪) জাতীয় সঙ্গীত এমন কোনো মানুষের সামনে না গাওয়া যার এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, যতক্ষণ ওই মানুষ না বোঝে যে এটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং এটাকে সম্মান জানানো উচিত। (৫) আপত্তিকর বস্তুর উপর প্রকাশ করা যাবে না জাতীয় সঙ্গীত যার ফলে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা হয়। এছাড়াও সিনেমা শুরুর আগেই সমগ্র দেশের সিনেমাহলগুলিতে যেন জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর নির্দেশ এবং সরকারি অনুষ্ঠানে যেখানে সাংবিধানিক পদের লোক উপস্থিত থাকবেন সেখানে যেন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা বাজানোর নিয়মাবলী পালন করা হয়।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ওই মামলা শুনানির জন্য ওঠে ৩০ নভেম্বর দুই সদস্যের বেঞ্চে। সদস্যরা হলেন যথাক্রমে বিচারপতি দীপক মিশ্র ও বিচারপতি অমিতাভ রায়। কেন্দ্রের পক্ষে লিখিত জবাব না পেয়ে বিচারপতিদ্বয়ের বেঞ্চ জাতীয় সঙ্গীত বাজানো এবং অপব্যবহার রুখতে এক অগ্রিম নির্দেশ প্রদান করেন এদিন। ওই নির্দেশগুলি হচ্ছে :

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আর্থিক মুনাফা বা অন্য কোনো লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় সঙ্গীত বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।

(২) জাতীয় সঙ্গীত কোনো ভাবেই নাটকীয় ভাবে পেশ করা যাবে না এবং কোনো জলসায় গাওয়া বা দেখানো যাবে না। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে জাতীয় সঙ্গীত যখন গাওয়া বা দেখানো হয় তখন উপস্থিত সকলের উচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন। জাতীয় সঙ্গীতের নাটকীয় প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে অনুচিত।

(৩) জাতীয় সঙ্গীত বা তার অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো অশোভন স্থানে দেখানো যাবে না যেখানে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লঙ্ঘন হয়। কারণ জাতীয় সঙ্গীত এমন এক সঙ্গীত যা জাতীয় অখণ্ডতা, জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেমের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করে।

(৪) ভারতের প্রত্যেক সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে হবে সিনেমা শুরু

হওয়ার আগেই এবং হলে উপস্থিত সকলকেই দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(৫) সিনেমাহলের পর্দায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা দেখানোর পূর্বে সিনেমাহলের প্রবেশপথ এবং প্রস্থানের পথ বন্ধ রাখতে হবে যাতে করে কেউ জাতীয় সঙ্গীত প্রদর্শনে অসুবিধার সৃষ্টি না করে। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা দেখানোর পর সেই প্রবেশপথ বা প্রস্থানপথ খুলে দেওয়া যেতে পারে।

(৬) যখন সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে তখন সিনেমার পর্দায় জাতীয় পতাকা দেখাতে হবে।

(৭) যে কোনো ব্যক্তির তৈরি জাতীয় সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ কোনো কারণেই গাওয়া বা দেখানো যাবে না।

এছাড়াও সুপ্রিমকোর্টের পাঁচ পাতার অগ্রিম নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানের ৪ (এ) অধ্যায়ে থাকা মৌলিক কর্তব্যের কথা এবং ভারতের প্রতিটি নাগরিক সেই কর্তব্যগুলি মানতে হবে। সংবিধানের ৫১ (ক) অনুচ্ছেদে থাকা ১১টি মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে প্রথম কর্তব্যটিই হচ্ছে সংবিধান অনুসারে চলা এবং সম্মান প্রদর্শন তার আদর্শ, প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি। সুপ্রিমকোর্টের ওই নির্দেশে বলা হয়েছে যে আগামী ১০ দিনের ভিতরেই সমগ্র দেশ জুড়ে থাকা সিনেমাহলগুলিতে নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। ওইদিন শুনানির সময় কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজ্য সচিবালয়ে এই নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের প্রতিটি সিনেমাহলে যাতে এই নির্দেশ মেনে কাজ হয় সেটাও নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও এই বিষয়টি সম্পর্কে সকলকে অবগত করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।

পরিশেষে বলব, সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর বিষয়টা কিন্তু নতুন নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শুরু করে প্রায় ষাট-সত্তর দশক অবধি সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর রেওয়াজ ছিল। অবশ্য সেটা সিনেমার বিরতির সময় বা শেষ হওয়ার পর এক দায়সারা মনোভাব নিয়ে বাজানো হোত। তখন দর্শকদের দাঁড়ানোর কোনো রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বাজানোর রেওয়াজও কমে যায়। তবে ২০০৩ সালে মহারাষ্ট্রে প্রথম সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বাধ্যতামূলক করা হয়। তামিলনাড়ুতেও এই নিয়ম চালু হলে মাদ্রাজ হাইকোর্ট ওই নিয়মের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে।

ওই হাইকোর্টের মতে এতে সিনেমাহলে বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। অবশ্য সুপ্রিমকোর্টের এই অন্তবর্তী নির্দেশে সমগ্র দেশের সব সিনেমাহলে সিনেমার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে এবং জাতীয় পতাকা দেখাতে বাধ্য থাকবে। আর সেই সময় উপস্থিত দর্শকদের উঠে দাঁড়াতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ ঐতিহাসিক এই কারণে যে দেশের কোনো আইনে লেখা নেই যে জাতীয় সঙ্গীতের সময় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সময় দর্শকদের উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে হবে বলেছে। দেশেপ্রেমের কথা বোঝাতে গিয়ে রায়ে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এইরূপ : ‘‘Be it stated, a time has come, the citizens of the country must realize that they live in a nation and are duty bound to show respect to National Anthem which is the symbol of the Constitutional Patriotism and inherent national quality. It does not allow any different notion or the perception of individual rights that have individually thought of have no space. The idea is constitutionally impermissible.’’ রায়টি পড়ে মনে হয় আমাদের চৈতন্যের বড়ই অভাব। আজ আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগাতেও দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে ফরমান দিতে হচ্ছে। সেজন্য বোধহয় আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে ১৮৬৬ সালের ১ জানুয়ারি এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটিতে উপর থেকে নেমে এসে গিরিশ ও তাঁর সতীর্থদের বলেছিলেন— ‘তোমাদের আর কি বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক’। কিন্তু কই আমাদের চৈতন্য হলো? দেখা যাক এখন সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনে এবং আমাদের দেশপ্রেম জাগাতে কতটুকু চৈতন্য ফিরিয়ে আনে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

Principal For

Jaigaon Saraswati Shishu / Vidya Mandir

* Qualification : M.A./ M. Sc. / B. Ed.
* Fluent English Knowledge & Speaking
* Accomodation : Free

Please contact for Details :

Mr. Partho Ghosh

M. 98320-48835 / 83730-70481

কাঞ্চন গুপ্ত

প্রতিটি সময় জাতীয় সঙ্গীতের বিষয়টি খবরের শিরোনামে এসে থাকে। এখন সুপ্রিম কোর্টের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে সিনেমা হলগুলিতে এর উপস্থাপনার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ার যে বন্যা দেখা দিয়েছে তাতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ভারতীয় জাতি (‘নেশন’ অর্থে ব্যবহৃত), জাতিসত্তা এবং জাতীয়তাবাদের এই পবিত্রতম প্রতীকটির সম্বন্ধে খুব কম সংখ্যক মানুষই অবহিত রয়েছেন। এই অজ্ঞানতা রাজনৈতিক আদর্শবাদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষজন, সামাজিক মর্যাদা ও সম্প্রদায় পর্যন্ত প্রসারিত।

কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ সহজবোধ্য কারণেই, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে সিনেমা হলগুলিতে জাতীয় সঙ্গীতের পরিবেশনা বাধ্যতামূলক করার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে এমন মানুষ অবশ্যই রয়েছেন যাঁরা জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও মনে করেন যে একে বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।

জাতীয় সঙ্গীতের কাহিনিটি কি আপনার জানা আছে?

সর্বদা যেমন হয়ে থাকে অর্থাৎ সব বিতর্কের কেন্দ্র হিসাবে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে-বিপক্ষে মেকি মতবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে এক্ষেত্রেও। অপ্রয়োজনীয়ভাবে, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের প্রতি জটিল দৃষ্টিকোণ, যা গড়ে উঠেছিল বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ‘নেশন’ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি ইউরোপের বিকৃত ধারণাকে কেন্দ্র করে, তাকে বাকচাতুরির মাধ্যমে কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য ছাড়াই উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

মেধাভুক্তি অনুসারে জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে সাধারণের বিতর্কে তিনটি সত্যকে প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ‘জনগণমন’ গীতটি ভারতীয় জাতি (নেশন)-র বন্দনাগীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি ওই গানটি উপাসনার স্তোত্র হিসেবে লিখেছিলেন যা পরে ব্রাহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, গান্ধী-নেহরু রাজত্বের ভজনাকারী সম্প্রদায় কোনোমতেই এবং কখনোই চায়নি যে বেড়ে ওঠা ভারতীয় প্রজন্ম তাদের জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন হন। তৃতীয়ত, একজন চিন্তাবিদের জটিল মনস্তত্ত্বের থেকে রবীন্দ্রনাথ বহু দূরে অবস্থান করেন; যে চিন্তাবিদের লেখা আমাদের দ্বি-বিভাজনের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেখানে এক, বোকার মতো বিতর্ক আর দুই, নির্বোধের মতো আলোচনা করাই বুদ্ধিজীবী সমাজের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

অতএব, এবার জাতীয় সঙ্গীতের কাহিনিটি বলা যাক। আশা করা যায় যে যাঁরা এই প্রবন্ধটি পড়বেন তাঁরা তাঁদের সন্তান বা অন্য কোনো ছোটোদের কাছে এই গল্পটি করতে পারবেন।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে যা গৃহীত হয়েছে তা আসলে ব্রাহ্ম-সঙ্গীত বা স্তোত্রের প্রথম পাঁচটি স্তবকের মধ্যে প্রথম স্তবকটি। ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর পরব্রহ্মের আরাধনায় রবীন্দ্রনাথ এই গীতটি রচনা করেন। পরব্রহ্ম হলেন সত্য, ঈশ্বর এবং অনন্ত; মহাবিশ্বের চিরন্তন অধীশ্বর— যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন; যিনি নিরাকার, অপরিবর্তনীয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই সর্বশক্তিমান।

ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্যরা ‘আদি ধর্মে’ বিশ্বাসী। তাঁরা উপনিষদের আলোকে ধর্মকে বুঝতে আগ্রহী। পরব্রহ্মই তাঁদের একমাত্র আরাধ্য। পরব্রহ্ম হলো সর্বোচ্চ আত্মা,

রচয়িতা এবং আমাদের আত্মার সংরক্ষকও। একটি চিরন্তন আলোকবিন্দু, যা আমাদের পথ দেখায় যখন তমসা কেটে যায়, সেই আলোকপ্রবাহ আমাদের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে পথ-নির্দেশস্বরূপ। সেই পরব্রহ্মেরই নির্দেশে পরিচালিত হয় সমগ্র মহাবিশ্ব, এমনকী ভারতবর্ষও। ব্রাহ্ম-দর্শন এমন কথাই বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গানখানির মর্ম উপলব্ধি করতে হলে এর পশ্চাৎপট, এর প্রবণতা এবং সুমহান আদর্শগুলি সম্পর্কে জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায়, ভারতবর্ষের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত। আঞ্চলিকতা ও সীমা পেরিয়ে তাঁর বাণী আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। এই মহাবৈশ্বিক স্তোত্র এমন একজনের প্রতি নিবেদিত হয় যাঁর কাছে আমাদের জীবন ও সর্বস্ব সমর্পিত করা যায় যা ন্যায়নিষ্ঠ, সাধুতা এবং জীবনের আলোকবর্তিকার প্রতীকস্বরূপ। ভারতের মহিমান্বিত প্রতিমূর্তির তিনটি স্তম্ভ— সাম্য, ন্যায় ও বিচারের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে এদেশের অন্তর্নিহিত বাণীকে মূর্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

'জন-গণ-মন' প্রথমবার গাওয়া হয়েছিল ১৯১১ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে বহু শ্রোতার সামনে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহ্যই হয়ে গিয়েছিল যে গানের মাধ্যমে তাদের কর্মসূচির শুভ সূচনা হবে (১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন)। এর ফলে 'জন-গণ-মন' গানটি অচিরেই হয়ে উঠলো স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেকটি মন্ত্র বন্দে মাতরম্। এই দুই সঙ্গীতই আমাদের অন্তর থেকে উত্থিত হয় এবং মাতৃভূমির প্রতি কাব্যাশ্রিত প্রার্থনা প্রকাশ করে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালে 'জনগণ-মন' গাওয়া হলো মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে। এই প্রমাণ রয়েছে যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে এই গানটি পরিবেশিত হয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষক ও প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে। গানটি এভাবেই সাড়া ফেলেছিল, যা আগে ব্রাহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ব্রাহ্মোৎসবে গাওয়া হোত।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। তিনি মদনাপাল্লের থিয়োজফিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জেমস কাউসিনসের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কলেজের একটি সমাবেশে তিনি 'জন-গণ-মন' গানটি পরিবেশন করেন এবং সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষকদের সামনে এর দার্শনিক ভিত্তি তুলে ধরেন। ভাবাবিষ্ট কাউসিনস কলেজের প্রার্থনাসঙ্গীত হিসেবে তৎক্ষণাৎ 'জন-গণ-মন'কে গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন এধরনের সাংগীতিক স্তোত্রের সীমাবদ্ধতার কথা, বিশেষ করে ভাষাগতভাবে বহুধাবিভক্ত

> **"১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর পরব্রহ্মের আরাধনায় রবীন্দ্রনাথ এই গীতটি রচনা করেন। পরব্রহ্ম হলেন সত্য, ঈশ্বর এবং অনন্ত, মহাবিশ্বের চিরন্তন অধীশ্বর— যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন; যিনি নিরাকার, অপরিবর্তনীয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থেই সর্বশক্তিমান।"**

ভারতে সংস্কৃত মেশানো বাংলা ব্যবহার নিয়ে। তিনি তাই পরবর্তী কয়েকটি দিন 'জন-গণ-মন'-র অনুবাদের দিকে নজর দিয়েছেন এবং এর সুরের 'নোটেশন'গুলি লিখে ফেলেছেন। এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন জেমস কাউসিনসের পত্নী মার্গারেট যিনি পশ্চিমী ধ্রুপদী সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজিতে অনূদিত বিষয়টির নাম দিয়েছিলেন 'দ্য মর্নিং সঙ্গস্ অব ইন্ডিয়া' :

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

ভারতের স্বাধীনতার পর যখন গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য 'জাতীয় সঙ্গীত' গ্রহণের বিষয়টি এল, তখন রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'— দু'টির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার কথা উঠলো। এই দুটি গীতই ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্রস্বরূপ, বিশেষ করে ভারতের আত্মার বাণীমূর্তিরূপে এদের প্রতিষ্ঠা ছিল।

এর মধ্যে 'জন-গণ-মন'-র দিকে পাল্লা কিছু ভারী ছিল, কারণ ইতিমধ্যেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মাধ্যমে এটি রণ-সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানটির হিন্দি অনুবাদ করেছিলেন 'শুভ-সুখ-চৈন' এবং তাঁর আই এন এ ও প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গীত হিসেবে এই গীতের ব্যবহারও হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় যখন জওহরলাল নেহরু ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করলেন, তখন ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুর ও তাঁর অর্কেস্ট্রা আই এন এ-র সুরেই বাজিয়ে দিল— 'শুভ-সুখ-চৈন'। অন্যদিকে সেই থেকে এবং এখনও পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' আমাদের মাতৃভূমির স্তোত্র হিসেবে আজও গাওয়া হচ্ছে। 'বন্দে মাতরম্'-কে রণসঙ্গীতে রূপান্তরিত করে এর মহাত্ম্যকে ক্ষুণ্ণ করা হলো এবং এর আত্মাকে রিক্ত করে দেওয়া হলো।

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সংসদে নিম্নলিখিত বিবৃতি পাঠ করলেন :

একমাত্র বিষয় যেটি এখনো আলোচনার জন্য পড়ে রয়েছে সেটি হলো জাতীয় বন্দনার প্রসঙ্গ। প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত হবে এবং প্রস্তাব আকারে সংসদ এ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কিন্তু এখন অনুভূত হচ্ছে যে প্রস্তাবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে আমি জাতীয় সঙ্গীতের বিষয় কিছু বললে ভালো হয়। সেই অনুযায়ী আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি। কথা ও সুর সমন্বিত 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' শীর্ষক রচিত গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হলো এবং প্রয়োজনে সরকার গানটির কথা পরিমার্জনার অধিকারী হবে। এবং 'বন্দে মাতরম্' গান যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তা 'জন-গণ-মন'-র মতোই সমান সম্মানিত হবে এবং এর সমমর্যাদা পাবে।" এইভাবে গণতান্ত্রিক ভারতে রবীন্দ্রনাথের জন-গণ-মন 'জাতীয় সঙ্গীত' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ 'জাতীয় স্তোত্র'-এ রূপান্তরিত হলো।

(লেখক এবিপি নিউজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক ও সংবাদ ভাষ্যকার)

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯
সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

চিঠিপত্র

নোট বাতিল

সারাদেশে কালোটাকা উদ্ধার ও জালনোট রুখতে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই চমকপ্রদ নির্দেশে কালোটাকার কারবারিদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীরাও যে উচিত শিক্ষা পেল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতোই কালোবাজারি রুখতে মোদীজীর এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক স্বচ্ছ ভারত গঠনের পথকে সুগম করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তির এবং অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষ কিছুটা অসুবিধারও সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাঙ্কগুলোর কার্যকালীন সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু নোট বাতিল ইস্যুতে যেন ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছেন মোদী বিরোধীরা। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী আবার সব বিরোধী রাজনৈতিক দলকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছিলেন। তবে নেত্রীর এই রাজনৈতিক চাল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায়। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করা পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদ ও কালোবাজারিদের মদত দেওয়ার শামিল নয় কি? দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বচ্ছ ভারত গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকরী করাই তো যে-কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যেখানে বিভিন্ন হাইকোর্ট নোট বদলের সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিয়েছে। ভুললে চলবে না যে এর আগে ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৬ সালে ও ১৯৭৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই এধরনের ঘটনা ভারতবাসীর কাছে নতুন কিছু নয়। আবার সম্প্রতি ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৫০০ ইউরোর নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এই ঘটনা সারা বিশ্বেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেশ যখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তখন বাধ্য হয়েই এধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোটি কোটি টাকার বেআইনি ও জাল টাকার কারবারিদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতে দ্বিধা কীসের? আর সন্ত্রাসবাদী ও দুর্নীতিবাজদের সুযোগ না দিয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে মোটেই ভুল কাজ করেননি প্রধানমন্ত্রী। নোট বাতিলের ঘটনাকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা।

মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

সংবাদে প্রকাশ, একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের আশঙ্কানুযায়ী ডিমনিটাইজেসনের ধাক্কায় নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় অর্থনীতিতে 'বিশ্বাস'-টিকেই মেরে ফেললেন। তাঁর বক্তব্য— বাতিল হয়ে যাওয়া ৫০০, ১০০০ টাকার নোটগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিশ্রুতিপত্র---যাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর নোটবাহককে নোটে লেখা অঙ্কের সমপরিমাণ টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাতারাতি সেই নোট বাতিল কথার অর্থ, সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত করল। এই আশঙ্কার প্রেক্ষিতে বলতে চাই, ভারত সরকার 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত' করেনি। বরং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে বাতিল নোট জমা নেওয়া হচ্ছে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত জমা নেওয়া হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। হ্যাঁ, আয়কর না দেওয়া টাকা সহজ কথায় কালোটাকার একাংশ জমা দেওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য সরকার দায়ী হয় কীভাবে? ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নই আসে না।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সাহসীপদক্ষেপ

৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সাহসী পদক্ষেপ'। নোট বাতিল ঘোষণায় সারাদেশ তোলপাড়। নোট বদলাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে। দেশের স্বার্থে ভালকাজ করতে গেলে মানুষের কিছু অসুবিধা হয়। দেশের স্বার্থে সেটা মেনে নেওয়া উচিত। যাদের ঘরে জালনোট, কালোটাকা আছে তাদের মাথায় হাত, এক ঘোষণাতেই রাতারাতি অবৈধ টাকা সাধারণ কাগজে পরিণত হলো। কালোটাকাকে সাদা টাকায় পরিণত করার সুযোগ না পেয়ে মাথা খারাপের অবস্থা। কিছু জনপ্রতিনিধি অহেতুক বিরূপ মন্তব্য করে মানুষকে ভুল বোঝাতে ব্যস্ত। 'গোয়েবল্‌সিয়' নীতি অনুসরণ করে মিথ্যা প্রচারে রত।

পাকিস্তানের মতো পারমাণবিক শক্তিধর জঙ্গি দেশের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও নোট বাতিল ঘোষণা করে ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেজন্য মোদী সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

বিগত ৩০ নভেম্বর থেকে তিন দিন আমাদের রাজ্যের টোল প্লাজাগুলিতে সেনা টহল হয়েছে। যেটি নিতান্তই রুটিন মাফিক। এর মূল উদ্দেশ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কে নিত্য গাড়ির হিসেব রাখা যা প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর কাজে লাগবে। কিন্তু সেনার এই রুটিন মাফিক কার্যক্রম কারোর কাছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ

বলে মনে হচ্ছে। তিন-চারটি টোলে সেনার এই রুটিন কার্যক্রম যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ হয় তবে কলকাতায় উড়ালপুল ভাঙার পর সেনার উদ্ধারকার্য কী?

আর নির্বাচিত সরকার শব্দটি যারা বলেন তাদের রাজ্যেও অনেক নির্বাচিত পৌরসভা জেলাপরিষদ বিরোধীদের হাত থেকে আজ শাসক দলের হাতে। অনেক নির্বাচিত বিরোধী বিধায়ক আজ শাসকদলে। সবাই বলছেন তারা উন্নয়নের স্বার্থে জনতার রায় উপেক্ষা করে দল বদল করছেন। কিন্তু বিরোধী দলে থেকে কি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উন্নয়ন করতে পারতেন না? যদি না পারেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রী ব্যবস্থায় সেটি কতটা সমর্থনযোগ্য?

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

গ্রাম বিকাশে দত্তক গ্রাম

ভারতের প্রধানমন্ত্রী গ্রাম বিকাশকে লক্ষ্য রেখে দেশের সমস্ত এমপিকে দুটি করে গ্রাম দত্তক নিতে বলেন। তিনি নিজেও তার নির্বাচন কেন্দ্র বারাণসীতে দুটি গ্রাম দত্তক নিয়েছেন। তাঁর এই সদর্থক ভাবনায় শামিল হয়েছেন সারা ভারতের অনেক এমপি। এখানে দলগত মতবিরোধকে গুরুত্ব না দিয়ে গ্রামকে আদর্শ করে তোলার লক্ষ্যে শামিল করানো ছিল প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। কিন্তু সিপিএম এবং তৃণমূল দলের ঊর্ধ্বে উঠে এত বড় একটি সদর্থক ভাবনার শামিল হয়নি, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভোটের আগে এই এমপিরা কত প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু ভোট পেরনোর পর অনেক (বাংলার) এমপিকে তার নির্বচন ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো এমপি গ্রাম দত্তক না নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। একটি গ্রামের উন্নতিতে পাশের গ্রামের ঈর্ষা হবে— এই জন্য তারা গ্রাম দত্তক নেননি, এই যুক্তিটি নিতান্ত বালকোচিত এবং কাজ ফাঁকির গল্প। আমার প্রশ্ন, এই এমপিরা যে ধরনের জীবনযাপন করেন তা সাধারণ মানুষের মতো নয়, তাদের গাড়ি বাড়ি পোশাক সাধারণ মানুষের ঈর্ষার কারণ। তাই তখন কেন পশ্চিমবাংলার সিপিএম তৃণমূল এমপিরা সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেন না, করার কথা ভাবেন না। ধিক্ এইসব নির্বাচিত এমপিদের! এরা আবার ২০১৯-এর নির্বাচনে লোকের কাছে ভোট চাইতে যাবেন। যারা নিতান্ত দলের দাস দলের কাছে যারা মান ইজ্জত বিকিয়েছে শুধু একটি টিকিটের আশায় তারা স্বাধীনভাবে কোনো ভালো কাজ করতে পারবে না। তাই নির্বাচিত এমপিরা টিকিটের লোভ এবং হাইকমান্ডকে তুষ্ট না করে সাধারণ মানুষের কাজ করলে গ্রাম দত্তক নিলে ভাল বই মন্দ নয়। বড় দায়িত্ব পেয়ে যদি বড় কাজ না করে মন ছোট করে বসে থাকা যায় তাহলে বড় হওয়ার দায়িত্ব পাওয়াটা আপনা থেকেই চলে যাবে। তাই সকল সাংসদেরই সাবধান হওয়া দরকার।

—**মদনমোহন সিং,**
ডুমুরজলা, হাওড়া।

আহারে বাংলা

কবি সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' কবিতায় লিখেছেন, 'খাই খাই করো কেন এসো বসো আহারে।' আহা! কবির এই কল্পনা আজ সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে এরাজ্যে। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিস্কপ্রসূত 'আহারে বাংলা' বা 'খাই বাংলা' সম্প্রতি শেষ হয়েছে এই রাজ্যে। ওই 'খাই' উৎসবে কতশত মেনুর হাজিরা ছিল, কারা হাজির ছিলেন, তাঁরা কে কী খেয়েছেন সেই বারোমাস্যায় না গিয়ে একটা কথা বলতে চাই, উৎসব (মোচ্ছব)-টি যে পয়সাওয়ালা ধনী ব্যক্তিবর্গের সৌজন্যে আয়োজিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ, যে উৎসবে এক পিস ভাজা ইলিশ বিক্রি হয়েছে ২০০ টাকায় সেই উৎসব যে অঘোষিত ভাবে গরিবগুর্বোর জন্য নিষিদ্ধ ছিল তা বলাই বাহুল্য। কারণ এই মোচ্ছবের বাংলায় এমন অসংখ্য গরিব আছে যাদের দৈনিক উপার্জন ২০০ টাকারও কম। তাতে কী যায় আসে? তাদের জন্য তো রয়েছে সরকারের দেওয়া দু'টাকা কেজি দরের চাল। তাও আবার কখনও কখনও খাওয়ার অযোগ্য। কাজেই তাদের 'ছেড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন' না দেখলেও চলবে। 'আহারে বাংলা' তো দূর-অস্ত। অবশ্য তাদের জন্য যে একেবারেই কিছু নেই তা নয়। আছে, তবে মেলার ভিতরে নয়, বাইরে। পাঁচ টাকায় তেলেভাজা বেগুনি। 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো' আর কী! তাদের যে তাতেই আনন্দ! মমতাদি জিন্দাবাদ, আহারে বাংলা জিন্দাবাদ...

৩৪ বছরের বাম রাজত্বে আমরা দেখেছি গরিবদের নিয়ে রাজনীতি করতে। বামপন্থীরা রাজনৈতিক বা ক্ষমতার স্বার্থে গরিবকে গরিব করে রেখেছিলেন। তাই তখন রাজ্যের প্রায় একচতুর্থাংশ মানুষ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। পরিবর্তনের সরকার বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও গরিবদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ঘটার প্রশ্নই নেই। কেননা অতন্ত তিন লক্ষ কোটি টাকার দেনার দায়ে নিমজ্জিত এই সরকার উন্নয়নের টাকায় নিত্য নতুন উৎসব-মোচ্ছব, খেলা-মেলা, দান-খয়রাতিতে এতই মেতে উঠেছে যে রাজকোষ এখন 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। অথচ বাম- সরকারের মতো এই সরকারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার জিগির তুলছে। এমনিতেই এরাজ্যে ৫২ শতাংশ ডিএ বাকি, বেকারত্ব পর্বতপ্রমাণ, শিল্পের ঘটেছে গঙ্গাপ্রাপ্তি। তাই নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতেই এবং জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতে যে এই রাজকীয় 'আহারে বাংলা' মোচ্ছব তাতেও কোনো সন্দেহ নেই— যার আয়াজনেই সরকারের খরচ ১০ কোটি টাকা।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পল্লবরাজদের মন্দির

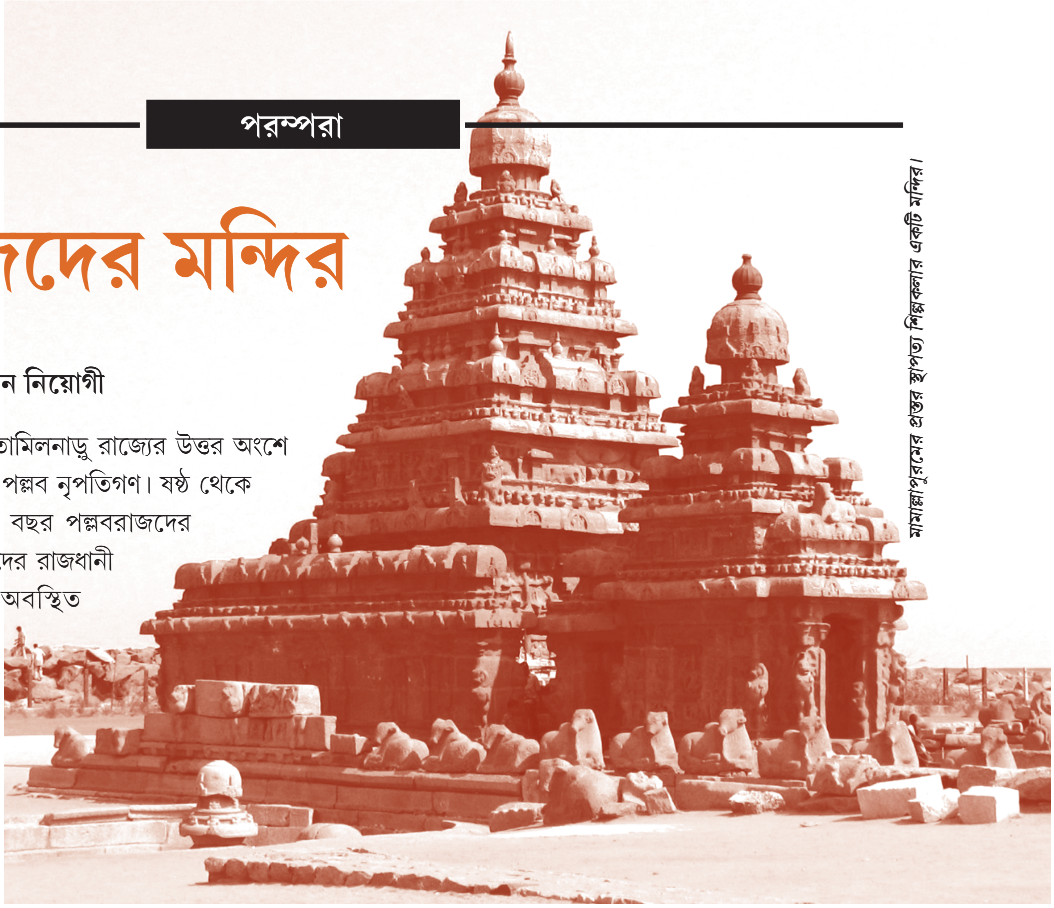

মামাল্লাপুরমের প্রস্তর স্থাপত্য শিল্পকলার একটি মন্দির।

সৌমেন নিয়োগী

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম থেকে তামিলনাড়ু রাজ্যের উত্তর অংশে রাজত্ব করতেন দক্ষিণ ভারতের পল্লব নৃপতিগণ। ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর পল্লবরাজদের শাসনকালে কাঞ্চিপুরম ছিল তাঁদের রাজধানী এবং বঙ্গোপসাগরের ধারে অবস্থিত মামাল্লাপুরম ছিল তাঁদের ব্যস্ততম বাণিজ্য বন্দর।

পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মনের (৫৮০-৬৩১ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি হয় দক্ষিণের কাবেরী নদীর তট অবধি এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় সূচিত হয় মামাল্লাপুরমের প্রস্তর স্থাপত্য যার পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার বিকাশ ঘটান তাঁরই সুপুত্র নরসিং বর্মন। ফলে ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেন থেকে প্রকাশিত এক World Map-এ সমুদ্রযাত্রারত নাবিকদের কাছে এই স্থাপত্য কীর্তিকে সপ্তমন্দির রূপে স্থানাঙ্কিত করা হয়, যা আজ UNESCO দ্বারা স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম।

বাণিজ্য বন্দর মহাবলীপুরমে পল্লবরাজদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল প্রখ্যাত বৈষ্ণব ভুদ্ধাঞ্জবরের জন্মস্থান। মহাবলীপুরম সে যুগের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর, তার উল্লেখ গ্রীকদের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনায় পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙের সপ্তম শতাব্দীর রচনাতেও পল্লব রাজাদের মহাবলীপুরমের উল্লেখ আছে এবং ইউরোপিয়ান সাহিত্যে 'Place of seven Pagodas' বলে নামাঙ্কিত রয়েছে।

মহাবলীপুরমের স্থাপত্য আসলে এক যুদ্ধ বিজয়ের সৌধ। পল্লবরাজ মামাল্লা নরসিংহ বর্মন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করেন ও তাঁর রাজধানী বাতাপিকে (অধুনা বাদামিকে) পুরোপুরি দখল ও ধ্বংস করেন এবং সেই বিজয় প্রাপ্ত সম্পদকেই, পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মনের দেখানো প্রস্তর স্থাপত্য শিল্পকলার পূর্ণ বিকাশহেতু মহাবলীপুরম নির্মাণ করেন। এই ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন, পরমেশ্বর বর্মন ও রাজসিংহের প্রয়াস ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রস্তর স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্বে। যেহেতু মহাবলীপুরমের বেশিরভাগ স্থাপত্য পল্লবরাজ নরসিংহের সময়কার সেইহেতু এই স্থানের নাম মামাল্লাপুরম, তামিল 'মামাল্লা' অর্থে বীর কুস্তিগীরকে বোঝায়। 'পল্লব' কথার অর্থ সংস্কৃতে অঙ্কুর, পুরাণ কাহিনি অনুসারে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্তৃক নাগরাজ-কন্যার সংযোগের ফলে, পদ্মের অঙ্কুরোদ্গম ন্যায় নবজাত পুত্র সন্তানের 'পল্লব' নামকরণহেতু এই রাজবংশের নামকরণ পল্লব এবং প্রত্যেক পল্লব রাজার নামের শেষে বর্মন সংযোজনের অর্থ ভগবান বিষ্ণুর সহায়ে পল্লব রাজারা সুরক্ষিত, সেই অর্থে ভগবান বিষ্ণুই যেন তাঁদের পূর্বপুরুষ স্বরূপ। পল্লবরাজ মামাল্লা ও রাজসিংহের শাসনকালে একক প্রস্তর বিশিষ্ট গ্রানাইট পাথরের প্রস্তর স্থাপত্য শিল্পকলাই হলো দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম শিল্পকলা। বেশিরভাগ স্থাপত্যই সমুদ্র নিকটবর্তী গ্রানাইট পাথরের উঁচু টিলা পাহাড়কে খোদাই করে নির্মিত, যার মধ্যে ৩০ মিটার × ১২ মিটার পৃথিবী বিখ্যাত ভাস্কর্য 'Bas relief work' গঙ্গাবতরণ (Arjuna's Penance) পাঁচটি মোনালিথিক মন্দির পঞ্চরথের একটি সমাহারে, দক্ষিণের দিকে খানিকটা বাইরে স্থাপিত। নাটকীয় ভঙ্গিমায় সমুদ্রের দিকে উন্মোচিত 'Shore temple' যা মামাল্লাপুরমের প্রস্তর স্থাপত্য শিল্পকলার এক উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় পুরাতাত্ত্বিক স্থান। ১৯৮৪ সাল থেকে তা UNESCO World Heritage-এর অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 'Bas-relief' হলো গঙ্গাবতরণ/ Arjuna's Penance, যা ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে অনন্য এক সৃষ্টি। সমগ্র ভাস্কর্যের খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবিক উচ্ছ্বাসের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দু'টি বিশাল পাথরের মাঝে সামান্য সরু ফাঁক, এর মধ্যে প্রস্তরটি খোদিত বিভিন্ন দেবদেবী, গন্ধর্ব, হস্তী ও

পঞ্চরথ মোনোলিথিক মন্দিরের একটি।

অন্যান্য সকল প্রাণীর মূর্তির দ্বারা রয়েছে পঞ্চতন্ত্রের বেড়ালতপস্বীর ভাস্কর্য যেন প্রবাহমান এক চিত্র। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই Bas relief দ্বৈত অর্থ বহন করে— এক দিকে ভগীরথের গঙ্গাবতরণ ও আশুতোষ শিবকে তুষ্ট হেতু অর্জুনের তপস্যা, কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হলো এখানে তপস্যারত পল্লব নরেশ নরসিংহ বর্মনকে দেখানো হয়েছে, উৎকর্ষের আদর্শ স্বরূপ যার গৌরবগাথাই হলো এর অর্থ, যেমন করে গঙ্গার মর্তে তাঁর পুণ্য অবতরণের ফলে ধরিত্রী হয়ে উঠে সভ্যতার বিকাশযোগ্য, ঠিক সেই রূপই অতীন্দ্রিয় বিষ্ণু মাহাত্ম্যে পল্লবরাজেদের এই মহাবলীপুরমে আগমন এক সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মহিমা দান হেতু এই অভাবনীয় সংরচনার জন্ম। গঙ্গাবতরণের পাশেই রয়েছে ছয় স্তম্ভের সিংহের ভিতের উপর নির্মিত ‘পঞ্চপাণ্ডব গুহা’। এর ঠিক পাশে স্তম্ভের দ্বারা আশ্রিত বিশালাকায় ‘কৃষ্ণমণ্ডপে’ রয়েছে কৃষ্ণের গোবর্ধন উত্তোলন দৃশ্য ও অন্যান্য ভাস্কর্য। শতাব্দী অতিবাহিত পাথরের উপর ‘Balance’ করা ‘Krishna's Butterball’ গঙ্গাবতরণের ঠিক উত্তরে অবস্থিত রয়েছে ত্রিমূর্তি; অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের গুহা মন্দির ও কোটিকাল মণ্ডপ। সপ্তম শতাব্দীর শেষ অর্ধে পল্লবরাজ পরমেশ্বর বর্মন নির্মাণ করেন রথের আকৃতির একক প্রস্তর খোদিত গণেশ রথ মন্দির। ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে একটি হলো বরাহ অবতার। তাই তাঁকে উৎসর্গ করে পল্লবরাজ নির্মাণ করেন বরাহ মণ্ডপ যার মধ্যে বিপুলাকায় ভূদেবীকে রক্ষারত বিষ্ণুর বরাহমূর্তি এক অদ্ভুত ভাস্কর্যের দ্বারা শোভিত, রয়েছে বামন অবতার রূপ অসুররাজ বলিকে ত্রিপাদ প্রদান হেতু ভগবান বিষ্ণুর অতীবসুন্দর ত্রিবিক্রম মূর্তি। পল্লবরাজদের পরবর্তী অধ্যায় মামাল্লাপুরমের গৌরব রক্ষার্থে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গ একটি বৃহৎ গোপুরাম নির্মাণ করেন, যা ‘রায়া গোপুরাম’ অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের নামে নামাঙ্কিত। রায়া গোপুরমের দক্ষিণে রয়েছে বিশালাকায় মহিষমর্দিনী গুহা, রয়েছে সিংহবাহনা দেবীর মহিষাসুর বধের প্রস্তর ভাস্কর্যের দৃশ্য। মহিষমর্দিনী গুহার ঠিক মাথার উপর অষ্টম শতাব্দীতে পল্লবরাজ রাজসিংহ নির্মাণ করেন ওলাক্কানাথ শিবের মন্দির যা হয়তো সে যুগের লাইট হাউসের কাজ করতো। মন্দিরটি রাজমিস্ত্রির কাজ প্রয়োগ করা হয়েছে, রয়েছে শিবের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি যেমন দক্ষিণামূর্তি, রাবণ অনুগ্রহ মূর্তি ইত্যাদির অলংকরণ। এই উচ্চ স্থান থেকে ‘Shore temple’ এর Arial veiw পাওয়া যায়। পাহাড়ি উচ্চ টিলা অঞ্চল থেকে ১০০ মিটার দক্ষিণে রয়েছে মনোলিথিক সৌধ পঞ্চরথ যা মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব ও তাঁদের পত্নী দ্রৌপদীর নামে নামাঙ্কিত, যদিও এর পিছনে কোনো ঐতিহাসিকতা নেই। পল্লবরাজদের রাজধানী কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির-সহ মামাল্লাপুরমের ‘Shore Temple’ হলো পল্লব স্থাপত্য শিল্পকলার এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই মন্দির শৈলীর মনোলিথিক দ্রাবিড়ীয় বিমান নির্মাণ পদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে ডেকানের ও দক্ষিণের রাষ্ট্রকুট রাজাদের ইলোরার কৈলাস মন্দির ও পট্টডাকালের চালুক্য রাজাদের বিরুপাক্ষ মন্দির করতে এক অভাবনীয় অবদান প্রদান করেছে, এখানেই পল্লব স্থাপত্যের আসল গরিমা। Shore Temple-এর মূল কক্ষে রয়েছে অনন্তশায়িত বিষ্ণু এবং শিব, পার্বতী-সহ স্কন্ধ অর্থাৎ কার্তিক, তাই সোমস্কন্ধ মূর্তি। মন্দিরের পাঁচিলে রয়েছে সারিবদ্ধ সাজানো নন্দী মূর্তি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে মামাল্লাপুরমের হস্তান্তর হতে থাকে পল্লব রাজাদের থেকে নির্মিত হয়ে চোল রাজত্ব ও বিজয় নগর সাম্রাজ্যের অধীনে, যার প্রথম ইউরোপিয়ান বর্ণনা পাওয়া যায় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম চেম্বার প্রথম মহাবলীপুরম দেখেন এবং ১৮শতকে ব্রিটিশ পর্যটক দল এই স্থানকে বালির মধ্যে চাপা পড়া অবস্থায় দেখেন যা সম্ভবত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই শুরু হয়েছিল।

পরিশেষে, কালের অস্তাচল থেকে বিশ্বের জনসমক্ষে উন্মোচন করেন ‘কলিন ম্যাকিন্‌জি’--- যার ফলে আজ এই ঐতিহাসিক সৌধটি সমগ্র বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাতে পারছে পল্লব নৃপতিদের স্থাপত্যকলা দর্শন করার জন্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কীভাবেই তার প্রভাব বিস্তার লাভ, যেমন কাম্বোডিয়া, চম্পা, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দেশে। ■

আদিত্যরূপী বিষ্ণুর বিচরণ

পরম্পরা

অমিত ঘোষদস্তিদার

ত্রিভুবন সমন্বিত মূর্তিতে মানুষকে ইহলোক ও পরলোকে শুভবুদ্ধি দেওয়ার জন্য আদিত্যরূপী বিষ্ণু বারোমাসে এই লোকের সর্বত্র বিচরণ করেন গন্ধর্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অপ্সরাদের সঙ্গে নিয়ে।

তাঁর মধ্যে স্থিত বিশ্ব। বিশ্বমধ্যে স্থিত তিনি। সমস্ত মানবকুল, জীবকুল, উদ্ভিদকুলের মধ্যে তিনি বিদ্যমান। প্রাণহীন, নির্জীব পদার্থের মধ্যেও তিনি বিদ্যমান। ঈশ্বর-কণাতেও বিদ্যমান। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী তিনি বিদ্যমান।

রূপময় সেই বিরাট পুরুষের দুই পা হলো পৃথিবী। মাথা হলো স্বর্গলোক। আকাশ তাঁর নাভি। সূর্য তাঁর নয়ন। বায়ু হলো নাসিকা এবং দিক হলো তাঁর কান। এই বিরাট পুরুষের শিশ্ন হলেন প্রজাপতি। মৃত্যু তাঁর অপানবায়ু। সমস্ত লোকপালগণ তাঁর বাহু। চন্দ্র তাঁর মন, তাঁর ভ্রূ-যুগল হলেন যম। এই পুরুষের অধর দু'টি লজ্জা ও লোভ। জ্যোৎস্না তাঁর দন্তরাশি, ভ্রম এঁর হাসি, বৃক্ষরা সব রোম এবং মেঘ হলো তাঁর কেশ। গলার বনমালা হলো তাঁরই বিভিন্ন মায়া। চেতনা অধিষ্ঠিত সেই বিরাট মূর্তির অঙ্গের পীতবাস হলো ছন্দ, প্রণব বা ওঁ হলো তাঁর ব্রহ্মসূত্র বা উপবীত। কর্ণে দোদুল্যমান কুন্তল হলো সাংখ্যযোগ। তিনি ব্রহ্মপদকেই শিরোভূষণ হিসেবে ধারণ করেন। অনন্ত নামে পদ্মাসনে তিনি বসে রয়েছেন। তাঁর হাতের গদাটি হলো তেজ, সাহস ও বল-যুক্ত প্রাণতত্ত্ব। শঙ্খ হলো জলতত্ত্ব আর ঘূর্ণায়মান চক্র হলো তেজস্তত্ত্ব। নির্মল আকাশতত্ত্ব এঁর অসি আর চর্ম হলো তমোময়। হাতের শার্ঙ্গধনুটি হলো কাল এবং তূণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সমস্ত কর্ম। ইন্দ্রিয়গুলি এঁর ধনুকের তির, মন হলো রথ। এই

মহানদেব পূজার ভূমি হলো সূর্যমণ্ডল। চামর হলো ধর্মওজশ। নীলকণ্ঠ হলো যাবতীয় গুণ, বৈকুণ্ঠ হলো তাঁর ছত্র, অকুতোভয় হলো এঁর কৈবল্যধাম।

ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ বিশ্বস্থিতার বাহন গরুড়। যজ্ঞরূপ পুরুষকে এই গরুড়-ই বহন করেন। নারায়ণ হলেন সামগ্রিক আত্মা। অনপায়িনী অর্থাৎ অবিনাশী শক্তি হলেন শ্রী, তিনি লক্ষ্মীরূপে তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিরাজিত। এই বিরাট পুরুষের চারমূর্তি— বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। এই চারমূর্তি তাঁরই প্রতিরূপ বা অবতার। নারায়ণই বাহ্য পদার্থ, মন, সংস্কার এই তিনের অনুগত জ্ঞানরূপ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বৃত্তি দিয়ে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়— আত্মার এই চার অবস্থা হিসেবে কল্পিত হন। ভগবান বিষ্ণুই বেদের কারণ। তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং স্বমহিমাতেই মহিমান্বিত। তিনি মায়া দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তাই তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। তাঁর নির্মল যশের কথা গান গেয়ে জগৎকে প্লাবিত করেন নারদ এবং গোপিনীরা।

সমস্ত জগতের আত্মা ও সৃষ্টিকর্তা শ্রীহরিই সূর্য। তাঁরই অনাদি অবিদ্যা থেকে সূর্যের উৎপত্তি। লোকযাত্রা প্রবর্তনের কারণে এই লোকেই সূর্য আজও বর্তমান। শ্রীহরি স্বরূপত এক। কিন্তু কালের কারণেই বেদের সমস্ত কর্মের মূল হিসেবে তাঁকে ঋষিরা বারে বারে বহুরূপে বর্ণনা করেছেন। নারায়ণরূপী সূর্যই মায়ার দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্তা, কারণ, কর্ম, মন্ত্র, দ্রব্য এবং ফলরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন।

ভগবান আদিত্যই কাল। লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে আলাদা আলাদা দ্বাদশ গণের সঙ্গে বিচরণ করেন। প্রতিমাসে সূর্যে বিষ্ণুর সাতটি করে মূর্তি প্রকাশিত হয়।

বৈশাখে সূর্যের নাম অর্যমা।
জ্যৈষ্ঠে সূর্যর নাম মিত্র।
আষাঢ় মাসে সূর্যের নাম অজ্ঞাত।
শ্রাবণে সূর্যের নাম ইন্দ্র।
ভাদ্রে সূর্যের নাম বিবস্বান।
আশ্বিনে সূর্যের নাম ত্বষ্টা।
কার্তিক মাসে সূর্য হলেন বিষ্ণু।
অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যের নাম অংশু।
পৌষমাসে সূর্যের নাম হলো ভগ।
মাঘ মাসের সূর্যের নাম পূষা।
ফাল্গুন মাসের সূর্য হলেন পর্যন্য।
চৈত্র মাসে সূর্যের নাম ধাতা।

জ্ঞানরূপ অনাবৃত আত্মাতে আমাদের উপলব্ধি চিরন্তনভাবে মধুময় হয়ে বিরাজিত হোক, এই কামনা করি অনন্ত পদ্মাসনে। আদিত্যরূপী বিষ্ণুর বিচরণে আমাদের প্রাণ কলুষতা থেকে মুক্তি পাক। প্রতিদিন থেকে প্রতিমাস, প্রতিমাস থেকে প্রতি বছর— ক্রমান্বয়ে এইভাবে বিচরণকারী আদিত্যরূপী বিষ্ণুর রৌদ্রকিরণময় আশিস, আমাদের ইহলোক এবং পরলোক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন করে তুলুক। চিরন্তন থাক সৃষ্টি। সৃষ্টির চর্চিত রসে চারিদিক সুমধুর হয়ে ওঠুক। ■

ভূতের নিয়ম

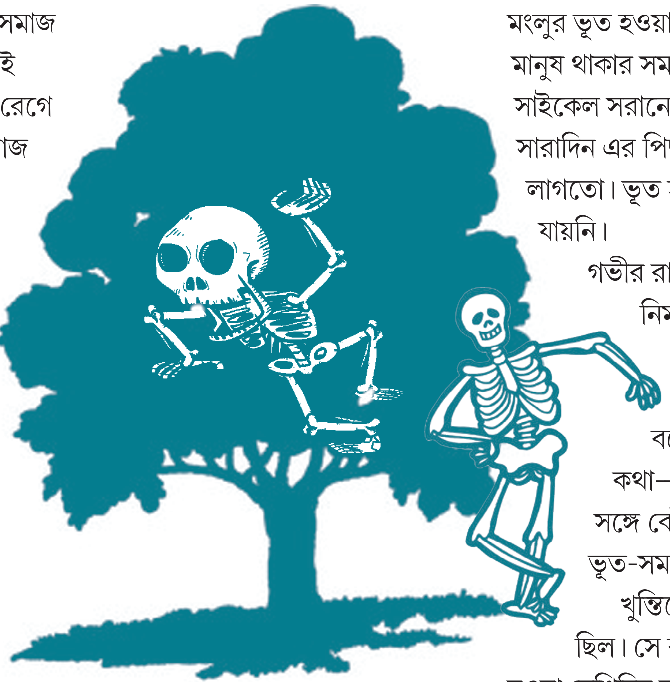

ভূত সমাজে ঢিঢি পড়ে গেছে। শিবকালীতলার মংলু ভূত একটা সমাজ বহির্ভূত কাজ করেছে। তাই নিয়েই এত হইচই। ভূত-সর্দার ঘনা তো রেগে লাল। এবার বোধহয় মংলুকে সমাজ থেকে বের করেই ছাড়বে।

বেচারা মংলু পড়েছে বেকায়দায়। এই শীতে ভূতসমাজ যদি তাকে বহিষ্কার করে তাহলে সে যায় কোথায়? তাই সন্ধ্যে হতেই মংলু খুন্তিপেতনির কাছে এসে হাজির। পরামর্শ চাই। এর আগেও অনেকবার খুন্তিপেতনি তাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। মানুষ থাকার সময় দুজনের মধ্যে একটা ভাব ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল কিনা! খুন্তিপেতনি বলে— তা মংলু বল দেখি কী হয়েছে তোর?

মংলু মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল— হয়েছে আর কী, গত পরশু সন্ধ্যেবেলা আমার আস্তানার বড় বটগাছটায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। তখনই ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল মিত্তির বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। আমি ভাবলাম, বাচ্চা ছেলে ছেড়ে দিই। ভয় দেখিয়ে কী লাভ?

ঠিক সেই সময়ই হতচ্ছাড়া নেত্তভূত কোথা থেকে উড়ে এলো। এসে গাছের উঁচু ডালটায় বসে ছেলেটার দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। আমি দেখেই বুঝিছি, নেত্ত বাচ্চাটার ঘাড় মটকাবার মতলব করছে।

তুই বল খুন্তি, আমরা ভূত বলে কি কোনো আক্কেল জ্ঞান থাকা উচিত নয়? নিজের দল ভারি করার জন্য ওইটুকুন বাচ্চাছেলের ঘাড় মটকাবে?

আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। একটা গাছের ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিলুম নেত্তর দিকে। শুনেছি ওর দাঁত দুটো নাকি ভেঙে গেছে। তুই বল এতে আমার দোষ কোথায়?

সব শুনে খুন্তিপেতনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো। তারপর বলল— দোষ তো করেছিস মংলু, মহা দোষ করেছিস। ভূত হয়ে ভূতের সঙ্গে বেইমানি! মনুষ্যসমাজে ওসব চলে মানুষে মানুষে বেইমানি। কিন্তু ভূত সমাজে তো এসব চলে না। বিচার তোর হবেই।

খুন্তিপেতনির কথা শুনে খুব হতাশ হলো মংলুভূত। তাহলে কী আর করা যাবে, যা শাস্তি হবে মেনে নিতে হবে। মংলুর ভূত হওয়া বেশিদিন হয়নি। মানুষ থাকার সময় সে শিবকালীতলায় সাইকেল সরানোর কাজ করতো। সারাদিন এর পিছনে, তার পিছনে লাগতো। ভূত হয়েও সেই স্বভাব যায়নি।

গভীর রাতের শ্মশানের প্রকাণ্ড নিমগাছে মংলুর বিচার শুরু হলো। গাছের একেবারে মগডালে বসে ঘনা। তার এক কথা— ভূত হয়ে ভূতের সঙ্গে বেইমানি, এর শাস্তি ভূত-সমাজ থেকে বহিষ্কার। খুন্তিপেতনিও বিচারসভায় ছিল। সে বলল—মংলুর ভূত হওয়া বেশিদিন হয়নি। সবে সবে এসেছে, মানুষের স্বভাব এখনো যায়নি। তাই ওর শাস্তি একটু লঘু করা হোক।

ভূতেরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। মন্দ বলেনি খুন্তিপেতনি। ঘনা না মানলেও ভূতসমাজ বিধান দিল— আজ থেকে সাতদিন মংলু কোনো মানুষের মুখ দেখতে পারবে না। শিবকালীতলার পথও মাড়াতে পারবে না। আর এরপর যদি ভূত হয়ে ভূতের সঙ্গে বেইমানি করে তাহলে তাকে ভূতসমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। মংলু নিজের কান মুলল— এই কান মুলছি আর কখনো মানুষের মতো আচরণ করবো না।

খুন্তিপেতনি মুখ বাকিয়ে বলল— ঠেলার নাম বাবাজী।

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

শান্তিনিকেতন

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে গড়ে ওঠে শান্তিনিকেতন। তিনি সেখানে ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির ও আশ্রম স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠভবন নামে একটি বিদ্যালয় চালু করেন। তারপর সেই স্কুল ধীরে ধীরে বর্তমান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় তপোবন শিক্ষা পদ্ধতিতে আস্থা রাখতেন। তাই তিনি বিশ্বভারতীকে সেই ভাবে সাজিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর আবাসিকরা এখনও সেই পরম্পরা বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছে শান্তিনিকেতন একটি আদর্শ শিক্ষায়তন। প্রতিবছর এখানে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই পৌষমেলা শান্তিনিকেতনের আরেকটি ঐতিহ্য। বাংলার গ্রামীণ শিল্প সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র পৌষমেলা। এই মেলায় দেশ বিদেশের গুণীজনের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যেখানে শিক্ষা ছাত্রদের ব্যবহারিক জীবনকেও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

এসো সংস্কৃত শিখি

पुनरपि एकवारं प्रयत्नं कुर्मः।

পুনরায় একবার চেষ্টা করব।

मौनमेव उचितम्।

চুপ থাকাই ভালো।

तद्विषये अहं किमपि न वदामि।

ও বিষয়ে আমি কিছু বলব না।

विचिन्त्य एव वक्तव्यम्।

ভেবেচিন্তেই বলা উচিত।

तर्हि समीचीनम्।

তাহলে ঠিক আছে।

ভালো কথা

বাঘের কাণ্ডকারখানা

সকাল সাতটা। বাবার নাক ডাকার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মা স্নান ঘরে। সেই সুযোগে আমি ব্রাশ করতে করতে ডোরেম্যান দেখতে বসে গেলাম। দেখতে দেখতে মনে হলো— আজ চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেলে কেমন হয়! আমি বিছানা থেকে বাবাকে ডেকে তুলে সেই আবদার করলাম। বোয়ালমাছের মতো লাল টকটকে ঘুমচোখে বাবা বলল ঠিক আছে। আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। চিড়িয়াখানায় গিয়ে প্রথমে হাতি, ময়ূর, বিভিন্ন রকমের পাখি দেখলাম। তারপর যেই বাঘের খাঁচার দিকে যাচ্ছি অমনি দেখি কয়েকজন দৌড়ে আসছে। চিৎকার করছে— বাঘ বাঘ! আমরা একদিকে লুকিয়ে পড়লাম। বাঘটি তখন খাঁচা থেকে বেরিয়ে গর্র্ গর্র্ করছে। চোখের সামনে হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে। আমরা ভয়ে কাঁপছি। ঠিক তখনই ঘুমপাড়ানি গুলি করলো রেসকিউ টিম। বাঘটা মাটিতে নেতিয়ে পড়লো। আমরা যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

মৌনব দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল গু ম র

(২) প্র ত পা ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) লি কা নি ঙা

(২) চি ঙ্খ ল শ

১২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) ক্রিয়ান্বয়ন (২) হাতিবাগান

১২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) কবিয়াল (২) করতাল

উত্তরদাতার নাম

(১) ঋকদীপ কর্মকার, কালিয়াচক, মালদা (২) শুভম নাথ, ইটাহার, উঃ দিনাজপুর (৩) ঋষি সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া (৪) প্রিয়ম ব্যানার্জী, বেহালা, কলকাতা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

মায়ের কোনো বিকল্প নেই

রুনা চৌধুরী (রায়)

মায়ের জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হতেই শিশুর কান্নার শেষে 'মা' এই অর্ধস্ফুটিত আওয়াজ শোনা যায়। প্রতিটি শিশুরই প্রথম বুলি 'মা' মনকে আপ্লুত করে দেয়। মায়ের কোনো বিকল্প নেই। মায়ের ঋণ অপরিশোধ্য। মায়ের সিংহাসন সর্বোচ্চ। সেই তুলনাহীন জন্মদাত্রী মায়ের স্থান আমাদের হৃদয়ে পরমপবিত্ররূপে বিরাজমান। অথচ, সেই জন্মদাত্রী মা যদি নিজের ভূমিষ্ঠ শিশুকে ডাস্টবিনে বা পুকুরে, নদীতে ছুড়ে ফেলে মুখ লুকোয়, কিংবা মেয়ের বয়ফ্রেন্ডকে নিজের প্রেমজালে আবদ্ধকরে বশ করে ছিনিয়ে নেয়। মেয়ে বাধ্য হয় গলায় ফাঁস দিতে, মায়ের কামনা চরিতার্থতার লালসা থেকে বাঁচতে অথবা কোনো মা আবার জামাইকে মেয়ের সঙ্গে থাকতে না দিয়ে নিজের শয্যাসঙ্গী করে এবং সে খবর প্রচার হয়ে যেতেই জামাইকে নিয়ে বিষ খেয়ে দুজনে আত্মঘাতী হয়, সেইসব নারী কি 'মা' ডাক শোনার যোগ্য? নাকি 'মা' হওয়ার যোগ্য! ধিক্কার হয়, ঘৃণা হয়, ভেবে যে এরাও কোনোদিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু জন্ম দিয়েই যে কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা কুকার্যে লিপ্ত হয় তারা মা হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইসব নারী মাতৃজাতির কলঙ্ক।

আমেরিকার নিউজার্সির এক ঘটনায় বিশ্ববাসী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক প্রবাসী ভারতীয় মহিলা তার ছ-মাসের কন্যা সন্তানকে জ্বরের জন্য হসপিটালে ভর্তি করেছিলেন, কিন্তু শিশুবিশেষজ্ঞরা ওই কচিশিশুর উপর একের পর এক এমন এক্সপেরিমেন্ট চালান যে তিনমাস পর শিশুটির মৃত্যু হয়। মহিলাটিকে আই.সি.ইউ.-তে ঢুকতে দেওয়া হোত না এবং ডাক্তাবাবুরা তাঁর প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতেন না। মহিলার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, শিশুটির পোস্টমর্টেম করিয়ে জানতে পারেন যে শিশুটির দু'টি কিডনি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ও দুটো চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। সুবিচারের জন্য পুলিশ, কোর্ট কিছুই করতে বাকি রাখেননি। তাঁর প্রিয় কন্যাসন্তানকে কাচের বাক্সের মধ্যে গত তিন বছর ধরে বুকে আগলে রেখেছিলেন। অশ্রুপাতে দিন কাটলেও তিনি বসে থাকেননি। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কড়াডোজের ওষুধ দেওয়া এবং শিশুর অঙ্গ পাচার করার অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ভদ্রমহিলার প্রতিজ্ঞা যতদিন না অপরাধীরা ধরা পড়বে ততোদিন মেয়ের দাহসংস্কার করবেন না। তিনি ভারতে এসেও সুপ্রিম কোর্টের দরজায় করাঘাত করেছেন সুবিচারের জন্য। স্টারনিউজ, জি-নিউজ টিভির প্রতিটি চ্যানেলে তাঁর অশ্রুঝরা মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ঘটনা সমস্ত শ্রোতাকে হতবাক করে দিয়েছে। হৃদয়ের আবেগ নয়, সত্যি এই মায়ের তুলনা নেই। এই বিরল ঘটনায় তিনি চির নমস্য।

দশভুজা দেবী দুর্গা দেবতাদের দুঃখের কথা শুনে বিচলিত হৃদয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, মহিষাসুরকে বধ করে হলেন মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা। চার সন্তানের জননী তিনি। যেমন সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, করুণাময়ী, তেমনই শক্তিরূপিণী। মাতৃজাতি অসহায়ত্ব স্বীকার না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেবী দুর্গার মতোই তরোয়াল কোষমুক্ত করুক। বধ করুক সেই নরপিশাচদের, যারা নারীর আব্রু লুটে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরব হয়ে উঠুক, যারা ভ্রূণ হত্যা করছে।

আর মা নামের প্রহসন যারা করছে, সেইসব নিকৃষ্ট নারীদের মুখে কালি ছিটিয়ে সমাজচ্যুত করে দেওয়া হোক, যাদের কাছে জন্ম দেওয়া নিছক খেলা মাত্র। ■

বিমুদ্রাকরণ একটি সাহসী অর্থনৈতিক সংস্কার
অর্থনীতিতে অবশ্যই সুফল ফলবে

মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল সরকার ঘোষিত বিমুদ্রাকরণ প্রক্রিয়ার। এর অভিঘাতে যে অনেক হিসেব নিকেশ ওলট পালট হয়ে গেছে তা আর বলে দিতে হয় না। একটি মূলত নগদ নির্ভর অর্থনীতির দেশে ৮৬ শতাংশ আবর্তিত অর্থকে বাজার থেকে তুলে নেওয়া তাও আবার ১৩০ কোটি মানুষের সাদা-কালোয় মেশানো বিচিত্র কোষাগার উন্মোচনের মতো জটিল প্রক্রিয়ায় সত্যিই অচিন্ত্যনীয় ছিল। কিন্তু অসাধ্যকে সাধন করার প্রয়াস নেওয়াই তো যথার্থ নেতার কাজ। এই কর্মকাণ্ডের পর থেকেই এক ধরনের কৌশলী নেতা-নেত্রীরা দেশব্যাপী গোলমাল পাকিয়ে সৎ সিদ্ধান্তে আস্থা রাখা দেশের জনতাকে খেপিয়ে তোলার কোনো কসুর করছেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ওপর মানুষের বিশ্বাসে তাঁরা তেমন চিড় ধরাতে সফল হননি। এঁদের সাহায্য করতে বরাবরের মতোই এগিয়ে এসেছেন এক শ্রেণীর অতীতে রসেবশে থাকা অর্থনীতিবিদ। তাঁরা বৌদ্ধিক মদত দিয়ে পত্রপত্রিকার পাতা ভরিয়ে তুলছেন। যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তের প্রায়োগিক দিকে কিছু ভুল-ত্রুটি, মানুষের সাময়িক দুর্দশা যে ঘটবেই আর তার পরিণতিতে রাজনীতিগতভাবে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর ওপর তাঁদের ক্ষোভ কিছুটা বাড়তেই পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিয়ে দেশের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের কথাই যে ভেবেছেন তা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন কিছু প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। যাঁদের মতামত চিরকালীন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বপক্ষে কলমধরা পণ্ডিতদের থেকে কোনো নিরিখেই গুরুত্বহীন নয়। তেমনই বিদেশের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত তিন অর্থনীতিবিদের বিমুদ্রাকরণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ এখানে দেওয়া হলো। —সম্পাদক।

গত ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আচম্বিতে একটি কঠিন সংস্কার প্রক্রিয়ার কথা দেশবাসীকে জানান। সরকার সে রাত্রি থেকেই ৫০০ এবং ১০০০ টাকার বাজার চলতি মুদ্রা প্রত্যাহার করে নেয়। এ তথ্য ও তজ্জনিত উথাল পাথাল আজ সকলেরই কাছে দৃশ্যমান ও তার প্রভাব কমবেশি সব নাগরিকের ওপরই পড়েছে। এ নিবন্ধ লেখার সময় উল্লেখিত নোটগুলি কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের খাতাতেই জমা দেওয়া যাবে তাও ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পুরনো বাতিল হওয়া অর্থকে নতুন মুদ্রায় পালটে পুনরায় বাজারে চালু করার একটি বড় ধরনের বদলি খরচ থাকলেও এই অত্যন্ত সাহসিক ও বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে দেশকে উল্লেখযোগ্য সুফল এনে দেবে। যদিও দেশের তরুণ ও মধ্যবয়সী প্রজন্মের প্রচুর মানুষ এমন সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের সড়গড় করে নিতে প্রতিদিনই এগিয়ে চলেছেন তবুও আজকের তারিখে ভারত একটি মূলত নগদ-নির্ভর অর্থনীতি। এরই সুবাদে দেশের মধ্যে নগদ টাকার বিনিময়ে গরিষ্ঠাংশ লেনদেন হওয়ায় একটি সমান্তরাল অর্থব্যবস্থাও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বিশেষ করে কর ফাঁকি, বেনামি সম্পত্তি ক্রয়, প্রচুর পরিমাণ সোনায় বিনিয়োগ ও অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপে বিপুল অর্থ লগ্নি হয়ে থাকে। এই কাজকর্মের প্রবাহ দেশের এক শ্রেণীর নাগরিকদের অভ্যাসের গভীরে দানা পাকিয়েছে। ভারতীয় টাকাকে জাল করে সেই অর্থে ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের ভরণপোষণ ও দেশকে ধ্বংস করার কাজে তাদের লিপ্ত করার কাজ ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে গেছে। দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে এক বিপুল কালোটাকার অস্তিত্ব ও তার ক্ষতিকারক দিকটি ক্ষমতার অলিন্দে থাকা সকলেই স্বীকার করলেও এ যাবৎ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কেউ ভাবেননি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার মতো বড় ডিনোমিনেশনের মুদ্রা যার ওপরই কালো অর্থনীতির সবটা নির্ভরশীল তাকে রাতারাতি অকেজো করে দেওয়াটা নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে তো বটেই, এক বিরাট প্রভাবশালী অংশ যাদের ওই কালো অর্থনীতিতে একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল তাদের অবশ্যই আঁতে ঘা লেগেছে।

অতিথি কলম

প্রবীণ কৃষ্ণ

জগদীশ ভগবতী

সুরেশ সুন্দরেসন

নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা বিশিষ্ট নেতা ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে। আর এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে গেলে অবশ্যই এক ধরনের আকস্মিকতার প্রয়োজন। এই আকস্মিক উপস্থিতি ও সঙ্গে বিশাল দেশে তার অভিঘাত অবশ্যই কিছুটা কষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

তাই এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সংস্কারে এগোতে গেলে রাজনৈতিক সাহসের সঙ্গে নোট বদলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবশ্যিক বড় খরচের কথাও মাথায় রাখতে হয়েছে। একই সঙ্গে এই পরিচ্ছন্ন অর্থনীতির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন যে ভবিষ্যতে দেশবাসীর দীর্ঘমেয়াদি উপকারে আসবে এমন চিন্তাভাবনা করে কাজ করা সচরাচর রাজনীতির পরিসরে নজরে পড়ে না। বরং রাজনৈতিক পরিণামের আশঙ্কায় হাত গুটিয়ে 'চলতা হ্যায়' নীতি নেওয়া অনেক নিরাপদ রাস্তা। দেশবাসী সেটা দেখতেই অভ্যস্ত। তাই এত ছটফট ও তৈরি অস্থিরতা। এই প্রসঙ্গে কিছু অর্থনীতিবিদ যুক্তি দিয়েছেন যে হঠাৎ এই নোট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তে মানুষের সঙ্গে সরকারের অর্থনৈতিক চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে। দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার ওপর আর নাগরিকদের আস্থা থাকবে না। এটি সর্বৈব ভুল চিন্তা। মনে রাখতে হবে, সরকার বাতিল হওয়া নোটের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সমমূল্যের নতুন অর্থ বদল করে দিচ্ছে। অবশ্যই একটি বিশাল দেশে এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে অনেক অসুবিধে দেখা যাচ্ছে, নাগরিকদের কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে কিন্তু এর ধাক্কায় কালো অর্থনীতির সঙ্গে জুড়ে থাকা টাকা ব্যাঙ্কের আশ্রয়ে ঢুকছে। এর পরিণতিতে নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা বাড়ছে, সঙ্গে বাড়ছে করের আওতায় আসা এযাবৎ বাইরে থাকা শ্রেণী। বেশি সংখ্যায় কর কাঠামোর আয়ত্তাধীন হলে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি ঘটবে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় ভারতীয় অর্থনীতি লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বড়মাত্রায় ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাবে। নগদ লেনদেন অনেক হ্রাস পাবে।

অন্যদিকে, বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত গরিব বিরোধী বলে প্রচার চালানো হচ্ছে সেটিও কিন্তু যুক্তি-নির্ভর নয়। কেননা এই সংস্কার প্রক্রিয়ার সফল রূপায়ণের ফলে যে বর্ধিত কর ও আনুষঙ্গিক সারচার্জ আদায় তার গরিষ্ঠাংশই সামাজিক প্রকল্পগুলিতেই খরচ করা হবে। এতসব যুক্তি খাড়া করার পরও শেষমেশ বলা হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত নাকি একনায়কতান্ত্রিক। বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা বিশিষ্ট নেতা ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে। আর এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে গেলে অবশ্যই এক ধরনের আকস্মিকতার প্রয়োজন। এই আকস্মিক উপস্থিতি ও সঙ্গে বিশাল দেশে তার অভিঘাত অবশ্যই কিছুটা কষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

নতুন কম অঙ্কের টাকার সাময়িক অভাব ও টাকা তোলার নির্দিষ্ট মাত্রা বেঁধে দেওয়ার ফলে পেনশনভোগী ও বেতনভোগী মানুষদের মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে— এর মধ্যে নিত্যদিনের বাড়ির কাজকর্ম চালানোর খরচের ক্ষেত্রেও অসুবিধের প্রসঙ্গ বাদ যাচ্ছে না। এর মধ্যে গত নভেম্বর মাস ধরে প্রায়শই কত টাকা তোলা যাবে, কত টাকা জমা দিলে তা তদন্তের আওতার বাইরে যাবে, কত টাকাই বা জনধন খাতার পক্ষে নির্দিষ্ট— এ নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এগুলি অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো একেবারে তৃণমূল স্তরে এই সংস্কারের ওপর মানুষের যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে। এত বড় একটা দেশব্যাপী কর্মকাণ্ড যেখানে মানুষের রুটি-রুজি নির্ভর সব অসুবিধেতেও কিন্তু তীব্র অসন্তোষ, ভাঙচুর বা দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি বা লুটপাট বা গণবিক্ষোভের ঘটনা ঘটেনি। সেই কারণেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে মানুষের সমর্থন ধরে রাখতে সরকারের যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সমব্যথী হওয়ারও প্রয়োজন আছে। বিগত ২৮ নভেম্বর সংশোধিত আয়কর আইন অনুযায়ী হিসাব বহির্ভূত জমা দেওয়া টাকার ওপর ৫.৫০ শতাংশ কর ধার্য করে সরকার করদাতাকে রেহাই দেবে। যে জমাগুলির সম্পর্কে মালিকরা টাকার উৎস নিয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রস্তাব নেওয়ার ফলে শাস্তিমূলক বড় অঙ্কের কালো টাকার মালিকরা পিঠ বাঁচাতে কর দিয়ে টাকা ব্যাঙ্কে জমা করবে বলে মনে হয়। কালো অর্থনীতি থেকে সাদা অর্থনীতির দিকে এই যাত্রায় সরকার মদত দিতে প্রস্তুত। সাম্প্রতিক বেশ কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে বিমুদ্রাকরণের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সুফলের সম্ভবনা রয়েছে।

প্রথমত, চালু টাকার ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কের কোষাগারে জমা পড়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি জমা এখন ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরে দাখিল করা রিটার্নের সঙ্গে তালমিল করে দেখা হবে সেক্ষেত্রে হিসাব বহির্ভূত টাকার ওপর কর চাপবে। এর ফলে সরকারের ঘরে একটা বড় অঙ্কের উপরি আয় ঘটবে যার গরিষ্ঠাংশই সামাজিক প্রকল্পগুলিতে নিয়োগ করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে, বেগবান করার প্রভূত সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত, আমরা ইতিমধ্যেই নজর করছি মানুষের ডিজিটাল লেনদেনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এর ফলে এই এককালীন বিমুদ্রাকরণের অভিঘাত বরাবরের নগদ টাকায় লেনদেনে স্বচ্ছন্দ একটা বড় অংশকে প্রযুক্তিমুখী করবে আর লেনদেনের স্বচ্ছতার ফলে করখাতে আদায় বাড়া ছাড়াও বরাবরের জন্য একটা করদাতার নতুনশ্রেণী তৈরি হবে। যাকে বলে ট্যাক্স বেস।

তৃতীয়ত, সরকারের এই রামধাক্কায় নোট জাল করার প্রবণতাও ঝিমিয়ে পড়বে। নতুন ছাপা নোটগুলিতে জাল নিরোধক এমন কিছু প্রতিষেধক আছে যার ফলে জাল কারবার বন্ধের সুফল হাতেনাতে পাওয়া যাবে।

এত বড় কাজের রাজনৈতিক ঝুঁকি যে রাজনীতির কুশীলবরা নেবেন না অতীতে মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এবারে ভারতবাসী এমন এক নেতার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে, যিনি দেশ থেকে দুর্নীতি উপড়ে ফেলতে, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে যে-কোনো ধরনের রাজনৈতিক বাজি ধরতে পিছপা নন। এর ফলে দেশবাসীর প্রত্যাশা ও বিশ্বাস আরও বাড়ছে। আমরা তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতীক্ষায়।

(জগদীশ ভগবতী, কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির অধ্যাপক। প্রবীণ কৃষ্ণ জনস্ হপকিনস্ ইউনিভারসিটির ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক্সের অধ্যাপক এবং সুরেশ সুন্দরেসন কলম্বিয়া বিজনেস্ স্কুলের অর্থনীতির অধ্যাপক

মুসলমান তোষণই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অস্বাভাবিক জনস্ফীতির কারণ

কে. এন. মণ্ডল

মুসলিম লিগের ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি এবং কংগ্রেসের দুর্বল উদারপন্থী নীতির পরিণাম সাম্প্রদায়িক দেশভাগ। এই বন্টনের বিষময় ফল বাংলাভাগ। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলাভাগ রুখে দিতে পারলেও, বলিয়ান মুসলিম লিগের ১৯৪৬-এ কলকাতায় দাঙ্গা এবং ওই বছরের শেষে নোয়াখালি হত্যাকাণ্ডে বাঙালি জাতীয়তাবাদে যে চিড় ধরে, মোহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং হোসেন শহিদ সুরাবর্দির জিহাদে তা বিশাল ফাটলে পরিণত হয়। সুতরাং ঐক্যপন্থী বাঙালি কংগ্রেসি নেতারা বিশেষত পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদাররা এবং উচ্চমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুরা, যারা নোয়াখালি দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, মুসলিম লিগের ভারতভাগের প্রকল্প যদি ঠেকানো না যায়, সেক্ষেত্রে বাংলাভাগ মেনে নেওয়াই শ্রেয়। কারণ, বাংলা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি দেখিয়ে সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অঙ্গ করার জিন্নার প্রস্তাব বা সুরাবর্দি-শরৎ বসুদের সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবের যে কী পরিণতি হতে পারে, তা হিন্দুরা ভারতের একটি প্রদেশে সুরাবর্দির রাজত্বেই ভাল টের পেয়েছেন। সুতরাং কোনো প্ররোচনায় পা না দিয়েই বঙ্গীয় আইনসভার অংশ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ১৯৪৭ সালের ২০ জুন ৫৮-২১ ভোটে সংখ্যাধিক্যের জোরে বাংলাভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের একটি প্রদেশ করার প্রস্তাবে সায় দেয়। উদ্দেশ্য, হিন্দু বাঙালিদের জন্য একটি নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করা। ওপার বাংলার হিন্দুরাও আশ্বস্ত হলেন (অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের মিলিত সিদ্ধান্ত) ভবিষ্যতের নিরাপদ আশ্রয়ের স্বপ্নে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৃষ্টি তার ভবিষ্যতের রূপরেখা নিয়ে— জনবিন্যাসের গতিপ্রকৃতি নিয়ে।

এটা সকলেরই জানা, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন রেখা তৈরি হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান জনবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে। দেশভাগের পরে পূর্ববাংলা থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্বহারা হয়ে পশ্চিমবাংলা, অসম এবং ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে প্রবেশ করে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে পশ্চিমবঙ্গে। এদের অনেকেই রাজ্যের বাইরে পুনর্বাসিত হলেও অধিকাংশ মানুষ ভাষা-সংস্কৃতির আবেগগত একাত্মতার কারণে পশ্চিমবঙ্গেই বসতি স্থাপন করেন এবং তার ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্য হিন্দুদের পক্ষে মজবুত হয়। ১৯৪৭ সালে মুসলমান জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ২৫ শতাংশ যা কমে ১৯৫১ সালের সেনসাস অনুযায়ী নেমে আসে ২০ শতাংশে। এর সম্ভাব্য দুটি কারণ আছে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনার ফলে অনেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে এবং কেউ কেউ মুসলমান জাহানের সঙ্গে একাত্মতার মনস্তাত্ত্বিক টানে পূর্ববঙ্গে চলে যান। অবশ্য, ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল লিয়াকত-নেহরু চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে পূর্ববাংলা থেকে অভিবাসী অনেক মুসলমান আবার ভারতে তথা পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসেন। তবে, পাকিস্তান লিয়াকত-নেহরু চুক্তি পালনে আন্তরিক না হওয়ায় সামান্য কিছু বাঙালি হিন্দু পূর্ববাংলায় ফিরে গেলেও, স্থানীয় মুসলমানদের অত্যাচারে এবং সরকারি রক্ষাকবচের অভাবে তারা ভারতমুখী হয়ে ফের উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। তবে এই চুক্তির শর্তানুসারে ভারতের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পশ্চিমবাংলার একজন মন্ত্রীর পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে আশ্বাস প্রদানের ফলে, নতুন করে উদ্বাস্তু আগমন অনেকটাই প্রশমিত হয়েছিল। যদিও, এই অবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেই স্রোত আবার বাঁধভাঙা রূপ নেয় ১৯৬৪ সালে, সারা পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়— যার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, লিয়াকত নেহরু চুক্তির কোনো মর্যাদা পাকিস্তান দেয়নি--- এই চুক্তিতে পাক-প্রধানমন্ত্রীর সই ছিল একটি নাটক— নেহরুকে ছলনা করা মাত্র। কারণ ১৯৫০-এর দাঙ্গার পরে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর দেশত্যাগের ফলে ভারতের উপর যে অপরিসীম চাপ সৃষ্টি হয় তা বন্ধ করতে দরকার হলে আর একটি যুদ্ধে যেতেও নেহরু রাজি, এই হুমকি দেওয়া হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার ও দুরাবস্থার ভাগী হতে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে পূর্ববাংলায় যাওয়ার মতো মূর্খামি আর কোনো মুসলমান করতে চাইলেন না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনা এবং দালালদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে প্রায় যে ১ কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেন, তার মধ্যে ৮০ শতাংশ ছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দু এবং পাকসেনা, রাজাকার-আলবদর এবং মৌলবাদী মুসলমানদের আক্রমণে নিহত ৩০ লক্ষ মানুষের ৭০ শতাংশ ছিলেন হিন্দু। এছাড়া লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতাদের প্রায় অর্ধেক ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, অথচ ওই দেশের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের নীচে ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। স্বাধীনতার পরে, বিশেষত শেখ মুজিবুর হত্যার পরে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা পরোক্ষ সরকারি মদতে ফের সংখ্যালঘু উচ্ছেদ শুরু করে এবং বেগম খালেদা জিয়ার দ্বিতীয়বার ক্ষমতারোহণের পরে ২০০১-২ সালে তা আবার দাঙ্গার রূপ নেয়। শেখ হাসিনার রাজত্বকালে এই সংখ্যালঘু নিগ্রহের ঘটনা স্তিমিত হলেও কমবেশি চলতে থাকে এবং ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পুনরায় মাত্রা ছাড়ায়। যদিও প্রধানমন্ত্রী হাসিনার কড়া পদক্ষেপে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

বাংলাদেশের এই দাঙ্গাগুলির উল্লেখ

প্রাসঙ্গিক কারণ এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার জনবিন্যাসের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ১৯৭১ সালের পরে ভারতে আসা ৭০ লক্ষ উদ্বাস্তুর (বিভিন্ন পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে) অধিকাংশই এই পশ্চিমবঙ্গে থিতু হয়েছে এবং ২০১১ সালের সেনসাসে (জনগণনা) প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের খুব কম সংখ্যক মানুষই মাইগ্রেশন করে এসেছেন, তাই তাদের সার্বিক সংখ্যা বা ১৯৪৭ থেকে আসা এই সব মানুষের পরিবার পরিজনের বর্তমান সংখ্যা নিরূপণ কঠিন, কারণ কোনো আলাদা আদমশুমারি হয়নি, তবুও একথা বলা যায় যে তাদের সংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ— অর্থাৎ আড়াই কোটি হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও, ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলমান দেখানো হয়েছে— যা পরবর্তী শুমারিতে ৩০ শতাংশ ছাড়াবে। ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলার হিন্দু জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেও— এটা কোন জাদুবলে সম্ভব? ১৯৫১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই ৫০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেখানে ছিল ২৮১ শতাংশ মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৩৮৭ শতাংশ। এই বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকলে ২০৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে মুসলমান সমাজে অধিক জন্মহার এবং বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত বর্ধিত হারে মুসলমান অনুপ্রবেশ। বিএসএফ-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে, ধরা পড়া অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই মুসলমান। আর এই অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য বিপজ্জনকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ ছাড়াও মালদা উত্তর দিনাজপুর জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে--- বাকি সীমান্ত জেলাগুলিতেও পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছে।

কলকাতা-সহ সীমান্ত জেলাগুলিতে মুসলমান-অনুপ্রবেশ শুরু বাংলাদেশের জন্মের পরপরই, সে দেশে বিহারি বিতাড়নের পথ ধরে। এমনিতেই বিহারি মুসলমানদের কৃষ্টি ও ভাষা আলাদা হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বনিবনা হোত না, বরং বাঙালি মুসলমান এবং বিহারি মুসলমানদের মধ্যে খুলনা, খালিসপুরে সংঘর্ষ হয়েছে বারবার, তা বৈরিতার রূপ নেয় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বিহারিরা পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওই সমস্ত বিহারি মুসলমানরা বাংলাদেশে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় পাকিস্তানে যাওয়ার আবেদন জানায়— যা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। নিঃসঙ্গ- হতোদ্যম বিহারী মুসলমানরা ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে) অনুপ্রবেশ করে মূলত হিন্দিভাষী এলাকাগুলিতে থিতু হওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই সময়ের নেতা-মন্ত্রীদের সহায়তায় খিদিরপুর, মল্লিকপুর এবং পার্কসার্কাস বস্তি এলাকায় আশ্রয় নেয়। আর তাদের রেশনকার্ড দেওয়া এবং ভোটারলিস্টে নাম তোলার দায়িত্ব নেয় স্থানীয় মুসলমান নেতারা। খুব শীঘ্রই এরা মূলস্রোতের অংশ বলে দাবি করে পাকাপাকিভাবে বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ওই সরকারের এক মন্ত্রী স্বগর্বে ঘোষণা করে, সে আগে মুসলমান, তারপরে ভারতীয়। সুতরাং মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থরক্ষা যে তার মৌলিক কর্তব্য সে নিয়ে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। ওদিকে মুজিব হত্যার পরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, আর্থিক দুরাবস্থা, দুর্ভিক্ষ এবং কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা অনেক গরিব মুসলমানকে ভারতে চলে আসায় উৎসাহ জোগায়। কারণ ভারতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল এবং জনমজুরদের মজুরিও বেশি। এছাড়া, বিহারি মুসলমানদের এখানে এসে নিশ্চিন্তে বসবাসের উদাহরণ তো তাদের সামনেই আছে। সুতরাং মুসলমান অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকে আর এতে কুলোর বাতাস জোগায় বামফ্রন্ট সরকার স্রেফ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার আশায়। বিরোধী কংগ্রেস দলও ব্যাপারটা চেপে যায় তাদের পড়ে পাওয়া মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে। ৮০ এবং ৯০-এর দশকে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লী এবং মুম্বইতে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বামফ্রন্ট এবং মুসলমানদের সম্মিলিত বাধায় তা ব্যহত হয়। হাওড়া স্টেশনে হামলা চালিয়ে অনুপ্রবেশ- কারীদের মুক্ত করে নেওয়া হয় এমন ঘটনাও ঘটেছে। ভাবটা এরকম, যেন বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোই বেআইনি কাজ। এতে উৎসাহিত হয়ে নির্ভয়ে সীমান্ত পেরিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আশায় গত দুই-তিন দশকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলায়। সেই ট্রাডিশন সমানে এখনো চলছে— যদিও বাংলায় সরকার বদল হয়েছে। এই খেলায় তৃণমূল সরকার অন্য খেলোয়াড়দের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে— শুধু তাই নয় দেশভাগের শিকার বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের যারা এখনো রেললাইনের ধারে, সরকারি পতিত জমিতে অস্বাস্থ্যকর কলোনির জীবনযাপন করছে, তৃণমূল সরকার তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের সরকারি বিলের বিরোধিতাও করছেন— যা কিনা ৭০ বছরের স্বাধীনতা লাভের পরের অভিজ্ঞতায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা। অতীতে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানে সরকারের কঠোরতায় সরব ছিল সকল বিরোধীরা, আর আজ স্বাধীনতার বলি এই ছিন্নমূল বাঙালিদের শুধু ভারতীয় নাগরিকত্বের স্বীকৃতিতে বিভেদের রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন যারা, তারা কি দেশভাগের ভিত্তি ভুলে কেবলমাত্র মুসলমান তোষণের জন্য এই অবস্থান নিচ্ছেন ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে? এইসব বিরোধীরা জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তুর সংজ্ঞাটা একেবার দেখে নিলে ভাল করবেন--- অনুপ্রবেশকারীদের কোথাও নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় না। অথচ এই দলগুলি বাংলাদেশি মুসলমানদের ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে ক্রমাগত অনুপ্রবেশে জনবিন্যাসের যে ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে— সে বিষয়ে বেমালুম নীরব।

শুধুমাত্র জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিই নয়, এই অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, তার প্রমাণ খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, কালিয়াচক থানা আক্রমণ-সহ আরো বহু ঘটনা। এখনই এসব বন্ধ না হলে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে দুর্দিন ঘনিয়ে ওঠা শুধু সময়ের অপেক্ষা। সে এমন দুর্দিন যখন হিন্দু বাঙালিদের ঘরও থাকবে না, ঘাটও থাকবে না।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)

কোচিংয়ের ফাঁদে ছাত্র-অভিভাবক

সুতপা বসাক ভড়

অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা আজ পড়াশুনার নামে যে জালে জড়িয়ে পড়েছেন, তার জন্য তারা নিজেরাও অনেকাংশে দায়ী। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার দায়িত্ব প্রথমদিকে অল্প কিছু অর্থ ব্যয় করে গৃহশিক্ষক/শিক্ষিকা/ কোচিংয়ের ওপর চাপান, তারপর দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে, আর অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের ফাঁদে পড়ে খাবি খেতে থাকেন।

''কাকচেষ্টা, বকোধ্যানম্, স্বাননিদ্রা তথৈবচ
অল্পাহারী, গৃহত্যাগী বিদ্যার্থিনং পঞ্চলক্ষণম্।''

—অর্থাৎ কাকের মতো নিরলস চেষ্টা, বকের মতো একাগ্রচিত্ত, ঘুম হবে কুকুরের মতো (একটু আওয়াজেই উঠে পড়া), মিতাহারী এবং গৃহত্যাগ করে গুরুগৃহ বা আশ্রমে থেকে বিদ্যার্জন করা— পূর্বপুরুষদের নির্দেশানুসার এই পাঁচটি গুণ বিদ্যার্থীদের থাকা উচিত। আজকের দিনেও শ্লোকটি খুবই প্রাসঙ্গিক। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এই দু'পঙক্তির শ্লোকটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার করেন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ছাত্রছাত্রীরা যদি তা অনুসরণ করে, তবে নিঃসন্দেহে তারা জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

বর্তমানে পড়াশুনা করা ভীষণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এর জন্য অভিভাবকেরাও অনেকাংশে দায়ী। প্রয়োজন থাকুক বা না-থাকুক, অন্যের দেখাদেখি আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কোচিংয়ে পাঠাই। ওই বাবদ প্রাথমিক খরচ হয়তো খুব বেশি হয় না, কিন্তু দিনে দিনে তা বাড়তেই থাকে। তার ওপর পড়তে যাওয়া-আসাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। শারীরিক পরিশ্রমও অনেক বেশি হয়। বেশিরভাগ সময় ওইসব গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা কিছু সহজ উপায় বলে দিয়ে ছাত্রসমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এতে শিক্ষার্থীরা সেই শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে পড়তে ছোটে তাঁদের মর্জিমতো দক্ষিণা দিয়ে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক ভালভাবে পড়ার অভ্যাস তৈরি হয় না। অথচ পাঠ্যপুস্তকের যে আজকের দিনেও কোনো বিকল্প নেই— এই সত্যটা কিন্তু আমাদের মানতেই হবে। এমনকী হাতে-কলমে শিক্ষার সঙ্গেও পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই থাকে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য। প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ছে মীনাদির কথা। একজন খুবই পড়ুয়া এবং মেধাবী ছাত্রী মীনাদি বলেছিল যে-কোনো বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় বইটির নাম, লেখকের নাম থেকে শুরু করে শেষের প্রচ্ছদেও যদি কিছু লেখা থাকে— তা পড়তে। এতে নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছি। সেজন্য বর্তমান ছাত্রসমাজকেও মীনাদির ওই উপদেশ মনে করিয়ে দিতে চাই।

বাজার চলতি ব্যবসায়িক কোচিংয়ের ফাঁদে পা দেওয়া মানে নিজস্ব পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা অনেকটাই কমে যায় আর ধীরে ধীরে ছাত্র সমাজ ওই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করার কথা ভাবতেই পারে না। বাজারে নানারকম ভাল বই রয়েছে— পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে অনুশীলন করার মতো বই সব আছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকমণ্ডলী তো রয়েছেনই। এছাড়া আছে ইন্টারনেটের সুবিধা। সেখানে বিনামূল্যে অনেক পাঠ্যক্রম ভালভাবে বোঝানো হয়—নকল পরীক্ষা (mock test)-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের তৈরি করতে পারে। তাহলে অসুবিধা কোথায়? ছেলে-মেয়েরা সারাদিন মোবাইল- কম্পিউটারের দুষ্প্রয়োগ করতে পারে আর অভিভাবকেরা যদি একটু সতর্ক হই তাহলে তার সদুপযোগও করতে পারে! এ ব্যাপারে অভিভাবকদেরও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আর ছেলে-মেয়েদের ওপর নজর রাখতে হবে। আগে পরিবারের একেকজন একেক বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতেন। বাড়ির ছোটোরা সময়বিশেষে তাঁদের কাছেই পড়া বুঝে নিত।

পাড়াপ্রতিবেশীরাও অনেক সময় ওই ভূমিকা নিত। এখন কম্পিউটার সেই কাজ অনায়াসেই করছে।

এখন আমরা ছেলে-মেয়েদের সবকিছু চামচে করে গুলে খাইয়ে দিতে চাই। এতে ওদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার শক্তি হ্রাস পায়। শারীরিক ও মানসিক আলস্য এসে যায়। যে-কোনো কঠিন প্রশ্নের সমাধান করতে হলে নিজে চেষ্টা না করে কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু পরীক্ষার সময় কোথায় পাবে কোচিংয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে? এদিকে বাঁধা ছকের বাইরের প্রশ্ন সমাধান করার ক্ষমতাও নেই। সুতরাং যতই কোচিংয়ে যাক না কেন গোড়ায় গলদ থেকেই যায়। তারই প্রতিফলন হয় পরীক্ষার ফলে। তারপরেও শিক্ষা হয় না। এবার ওই পুরনো কোচিং বদল করে আর একটির সন্ধানে ছোটো— আদৌ কোনো লাভ হয় কি?

বিদ্যালয়ে ভর্তির আগে থেকেই গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে পড়া শুরু। তারপর বিদ্যালয়ে ঢুকলে সব বিষয়েরই কোচিং চাই। অনেক সময় একই বিষয়ের একাধিক শিক্ষক— এই কি আশানুরূপ ফলের চাবিকাঠি?

কোচিংয়ের বাহানায় শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। মোবাইল/ স্মার্টফোন, ল্যাপটপ/ নোটবুক/ট্যাবলেট সব চাই। দিনের অনেকটা সময় ফেসবুক, ওয়াট্‌সঅ্যাপ, হাইক, হ্যাং-আউট ইত্যাদিতে কাটে। অথচ দিনে মোট চব্বিশ ঘণ্টা। যতই কোচিংয়ে যাও, কিস্যু হবে না! বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারের থেকে অপব্যবহার হচ্ছে বেশি। এছাড়া অভিভাবকেরা অত্যধিক প্রাচুর্যের মধ্যে তাদের রাখছেন— ফলে সবদিক সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ছে। বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোচিং যাতায়াতের বাহানায় দামি জামা-কাপড়, জুতো, বাইক, দামি রেস্তোরায় খাওয়া সবই চাই শিক্ষার্থীদের। বাহ্যিক চাহিদা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

এই পরিস্থিতির লাভ ওঠাচ্ছে কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করে, আর পেয়েও যায়। অভিভাবকেরাও টাকা দিয়েই নিশ্চিন্ত। পরীক্ষার ফল কি টাকার অনুপাতে হয়?

মাধ্যমিকের পরে তো আর দেখতে হবে না— কোটা, কানপুর, দিল্লী, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি শুরু। বেশ কিছু সম্পন্ন অভিভাবক এই সময় প্রায় পাঁচ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করে থাকেন। অনেক সময় একটি কোচিংয়ের পড়া বোঝার জন্য আর একটি কোচিংয়ে ভর্তি হতে হয়— খালি দৌড়াও আর দৌড়াও। শিক্ষার্থীরা মানুষ না, যন্ত্র? ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বিষয়ভিত্তিক প্রাইভেট টিউটরদের দোকান। অগ্রিম টাকা জমা করে তবে ঢোকো— তারপর পড়তে এসো বা না এসো তোমার মর্জি।

এরপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাশ করে সরকারি কলেজ— সেখানেও খরচ বেড়ে গেছে। প্রাইভেটে আরও বেশি। মনে রাখবেন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন সব পড়াশুনার খরচ হয় লক্ষের অঙ্কে। এছাড়া কলেজ যাতায়াত, বই-খাতা, হস্টেলে থাকা-খাওয়ার খরচ আলাদা, অনেক সময় নিজস্ব কলেজে ভর্তির পরে সরকারি জায়গা থেকে ডাক আসে। এই সময় বেশ কিছু টাকার অপচয় হয় (ইউ জি সি-র টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম মানতে অনেক প্রতিষ্ঠানই গড়িমসি করে)। আশ্চর্যজনকভাবে, প্রাইভেট সংস্থাগুলি তাদের পরীক্ষার ফল বের করে শিক্ষার্থী ভর্তি করে নিলে, ধীরে-সুস্থে সরকারি কলেজের ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। অদ্ভুত ব্যবস্থার বলি হয় প্রতি বছর শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক। তা কোন রহস্যময় কারণে বছরের পর বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলে আসছে জানি না।

অনেক সময় কোথাও হয়নি বলে শিক্ষার্থীরা নতুন করে আরেকটি কোচিংয়ে ভর্তি হলো কয়েক লক্ষ টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে তারপর হয়তো কোনো কলেজে তার নাম উঠল। এক্ষেত্রে কোচিং সংস্থাটির পক্ষ থেকে টাকা ফেরত পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এর পরের চিত্রটাও কঠোর বাস্তব। সরকারি কলেজে ঢুকেও অনেকে পড়া চালু রাখতে পারে না। কারণ তাদের পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর না পেলে বের করে দেওয়া হয়। এমন বিদ্যার্থীর সংখ্যাও অনেক, অথচ এরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এসেছে। অনেকে অন্য নানা কারণেও মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়।

যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের মধ্যে কতজন ভাল চাকরি পায়? অনেক প্রতিষ্ঠান দাবি করে শতকরা একশো বা তারও বেশি প্লেসমেন্টের, কিন্তু বেতন কত? এদিকে অনেক শিক্ষার্থী এডুকেশন লোন নিয়েও পড়াশুনা করে।

বাস্তবে কিন্তু সব শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা ধনী নন এবং সব শিক্ষার্থী'ই মা-বাবার একটিমাত্র সন্তান নয়। এই ব্যয়বহুল পড়াশুনার চাপে তারা অনেকেই হাবুডুবু খায়। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পর বছর নষ্ট করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যর্থ হলে আছে হতাশায় ডুবে যাওয়া, সমাজে মুখ দেখাতে না পারার মতো মনোবিকার, সব মিলিয়ে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক উভয়ের মধ্যে একটা অভিপ্রেত নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়।

এবার একটু অন্যদিকে তাকাই। অনেক কৃতী শিক্ষার্থী নিতান্ত গরিব ঘর থেকে আসে। তাদের জন্য অপ্রতুল অর্থব্যয়ের ঢেউ থাকে না। নিজের চেষ্টা এবং এখনও কিছু সহৃদয় শিক্ষকের সহায়তায় তারা পরিশ্রম করে নিজেদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে কোচিংয়ের বিলাস-ব্যসনে ভাসমান ছেলে-মেয়েরাও খুব কম পৌঁছতে পারে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারা যায়, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা আজ পড়াশুনার নামে যে জালে জড়িয়ে পড়েছেন, তার জন্য তারা নিজেরাও অনেকাংশে দায়ী। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার দায়িত্ব প্রথমদিকে অল্প কিছু অর্থ ব্যয় করে গৃহশিক্ষক/শিক্ষিকা/ কোচিংয়ের ওপর চাপান, তারপর দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে, আর অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের ফাঁদে পড়ে খাবি খেতে থাকেন।

আজকের দিনেও পড়াশুনায় স্ব-মূল্যায়নের খুবই গুরুত্ব আছে। সংস্কার, অনুশাসন, নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের শিক্ষা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয় আর অভিভাবকেরাও এতে শান্তি পান। শিক্ষা মানে শুধুমাত্র ডিগ্রি বা প্যাকেজ নয়, শিক্ষা মানে জীবনের পথে সার্থকভাবে এগিয়ে যাওয়া। ■

মোলাই ফরেস্ট : একলা মানুষের দানবিক সংগ্রামের কাহিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জীবনের সব থেকে বড়ো অনুপ্রেরণার উৎস জীবন নিজেই। টিভিতে খবরের কাগজে এমন অনেক মানুষের সন্ধান আমরা পাই যারা আটপৌরে প্রাত্যহিকতার মধ্যে থেকেও অন্যরকম জীবনযাপন করতে পারেন। তাদের নিজের সময়ে তো বটেই ভাবীকালেও প্রাসঙ্গিক থাকতে পারেন।

নিজের হাতে গড়া অরণ্যে যাদব মোলাই পেং।

এরকমই একজন মানুষ যাদব মোলাই পেং। প্রায় তিন দশক আগেকার কথা। তখন তাঁর তরুণ বয়েস। একদিন লক্ষ্য করলেন গাছ না থাকার কারণে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা মরে যাচ্ছে। দৃশ্যটা মোটেই তার ভালো লাগেনি। কিন্তু তিনি তো আর সাধারণ নন যে ভালো লাগল না বলে চায়ের কাপে ঝড় তুলে বাড়ি ফিরে যাবেন। শুরু করলেন বাঁশগাছের চারারোপণ। যে এলাকার কথা বলছি তার পুরোটাই বন্যায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গাছপালা পশুপাখি কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এখন সেই ১৩৬০ একর এলাকার পুরোটাই জঙ্গল। যাদব মোলাই পেঙের নামে যার নাম মোলাই ফরেস্ট। যাদববাবু একাই এই অরণ্য সৃজন করেছেন।

কী নেই এই অরণ্যে! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থেকে শুরু করে ভারতীয় জলহস্তী, শতাধিক হরিণ, খরগোশ, হনুমান, নানান প্রজাতির পাখি— এমনকী শকুনও! কয়েক হাজার গাছ রয়েছে অরণ্যে। যার মধ্যে বাঁশগাছ রয়েছে ৩০০ একর এলাকা জুড়ে। প্রত্যেক বছর শতাধিক হাতি মোলাই ফরেস্টে আসে। মাস ছয়েক থেকে আবার ফিরে যায়। সাম্প্রতিককালে এই অরণ্যে ১০টি শাবকের জন্ম দিয়েছে পরিযায়ী হাতিরা। অরণ্য সৃজনের আনন্দে প্রায় বুঁদ হয়ে থাকা যাদব মোলাই পেং বলেন, 'যাতে প্রত্যেক শিশু জীবনে অন্তত দুটো গাছ লাগায় এবং তাদের বড়ো করে তার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা দরকার।'

যাদববাবুর যখন ১৬ বছর বয়স, অসমে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন জঙ্গলে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সাপেরা জলাভূমি ছেড়ে হয় পালিয়ে যাচ্ছে নয়তো মরে যাচ্ছে। স্মৃতি রোমন্থন করে যাদববাবু বলেন, 'আমি বাড়ির বড়োদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একদিন আমরাও যদি ওই সাপেদের মতো মরে যাই তাহলে ওরা কী করবেন! কিন্তু সকলেই আমার কথা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে আমি দমে যাইনি। সেদিনই ঠিক করেছিলাম পৃথিবীকে সবুজ রাখার জন্য আমি সারাজীবন লড়াই করব।'

কিছুদিনের মধ্যেই যাদববাবু বনদপ্তরকে সজাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দপ্তরের কর্তারা তাঁকে নিজের চেষ্টায় গাছ লাগাতে বলেন। বিন্দুমাত্র হতাশ না হয়ে তিনি ব্রহ্মপুত্রের দুই ধারের জমি চিহ্নিত করে গাছ লাগাতে শুরু করেন। প্রতিদিন অনেক গাছ লাগাতেন। গাছ লাগিয়ে তিনদশক কেটে গেছে। যদিও কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। বিশেষ করে গাছের জন্য জলের ব্যবস্থা করা ছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ দূরবর্তী অঞ্চলে একা মানুষের পক্ষে নদী থেকে জল বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি প্রত্যেক গাছের মাথায় বাঁশের মাচা বানিয়ে তাতে ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়ি রাখতেন। হাঁড়িতে থাকত জল। সপ্তাহে একবার ভরে দিলেই চলত। ছিদ্র দিয়ে পড়া জলেই দিব্যি চালিয়ে নিত গাছেরা। সম্ভবত বুঝতে পারত তাদের পালক একলা মানুষ, এর বেশি পারবেন না।

যাদববাবু অসমের মিশিং জনজাতির মানুষ। নিজের গড়া অরণ্যে কুটীর বানিয়ে তিন সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। বাড়িতে গোরু আর মোষ আছে। দুধ বিক্রি করে সংসার চলে। স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সেস তাকে সম্মান জানিয়েছে। জেএনইউ-এর সহ উপাচার্য সুধীর কুমার সোপ্রয় তাঁর নাম দিয়েছেন, 'অরণ্যপুরুষ'। কিন্তু এসব কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। কথায় কথায় শুধুই হাসেন আর বলেন, 'এই অরণ্যই আমার ঘরবাড়ি। জীবনে যে স্বীকৃতি বা সম্মান পেয়েছি তাই আমার অর্জন। আমি পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ।' ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

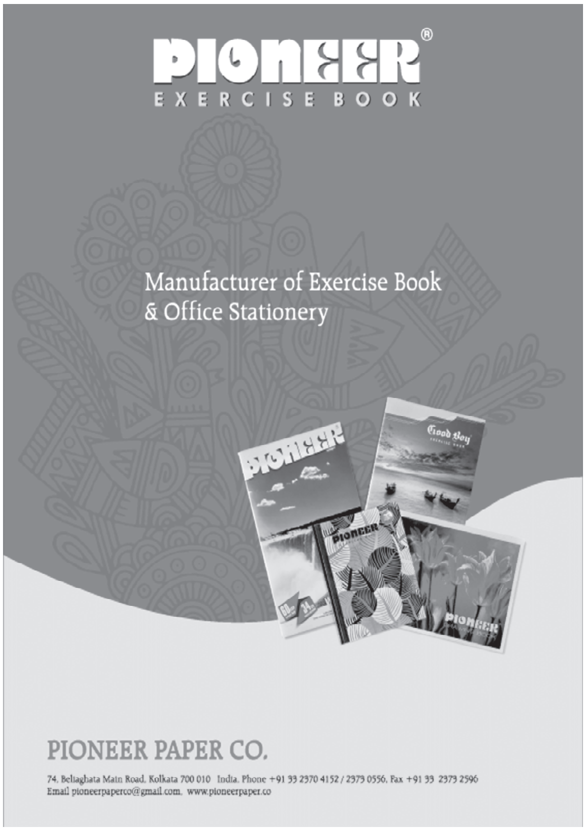

''কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, দক্ষিণেশ্বরের এই ঋষিবরের আবির্ভাব ভারতে বর্তমান যুগে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেউ একথা বিশ্বাস করেন এক কারণে, অপরে অন্য কারণে। ভক্তগণ মনে করেন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এসেছেন শেষ অবতাররূপে। ঐতিহাসিকদের বিচারে, যে ভাব-সহায়ে হিন্দুধর্ম গঠিত তারই ভিত্তিভূমিরূপে তাঁর আগমন। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন তিনি সকল সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করেছেন, কারো সঙ্গেই তাংর বিবাদ নেই। দার্শনিক তাঁকে সর্বোচ্চ বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহরূপে দেখেন। এমনকী, শূদ্রজাতীয় অনেকে তাঁর জন্মকালীন ঘটনা থেকে এই বিশ্বাস লাভ করেন যে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদেরও সমগ্র জীবনসংগ্রামকে পুরস্কৃত করেছেন। ''

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

শীতে রোগমুক্তি হোমিওপ্যাথিতে

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

শীতকালীন নানান সমস্যা যেমন, অ্যাজমা, হজমের সমস্যা, খুশকি, শুষ্ক ত্বক প্রভৃতি যে-কোনো রোগের উপশম হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে।

অ্যাজমা ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস :

এই ধরনের রোগের প্রকোপে যাঁরা সারা বছর ভোগেন, শীতকালে তাঁরা বেশি কষ্ট পান। তাপমাত্রা কমে গেলে হঠাৎ হঠাৎ হাঁপানির মাত্রা বেড়ে যায়। বিশেষত বয়স্কদের এই সমস্যা বেশি হয়। ছোটদেরও হতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হাঁপানি রোগীদের যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা থেকে দূরে রাখতে হবে। ধুলো, ধোঁয়া লাগাতে দেওয়া যাবে না। স্নান করার সময়ে গরম জল ব্যবহার করতে হবে।

যদি কাশি থেকে ক্রমে শ্বাসকষ্ট বাড়ে সেক্ষেত্রে ক্যাশিয়াক সোফেরা ওষুধ খেতে হবে। যদি রাত্রে শোওয়ার পর কাশি বেড়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কালির্কাব ৩০ খেলে সমস্যা কমে যায়।

ছোটদের ক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া ৩০, হিপারসালফ ৩০, ইপিকাক, মেডোরিনাম দেওয়া হয়।

যাঁদের অ্যার্লাজির জন্য শ্বাসকষ্ট হয় তাঁরা এরালিয়া রেসামোসা খেতে পারেন। কাশির জন্য যদি বুকে ঘড়ঘড় শব্দ হয় তা হলে ব্যাসিলিয়াম, অ্যান্টিমর্টাট ৩০ দিতে হবে।

জ্বর-সর্দি-কাশি :

শীতের শুরুতে যখন তাপমাত্রার ওঠানামা বেশি হয়, তখন অনেকের জ্বর-সর্দি-কাশির সমস্যা হতে দেখা যায়। বিশেষত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জ্বরের প্রবণতা বেশি হয়। শীতের শুরুর দিকে ঠাণ্ডা কম থাকায় অনেকেই গুরুত্ব দেয় না। এই সময় জ্বর এলে ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। এই রকম জ্বর বাড়লে রাসটক্স, হিপার সালফ, ব্র্যায়োনিয়া, কস্টিকাম প্রভৃতি ওষুধ দেওয়া হয়।

হজমের সমস্যা :

শীতকালে বেশিরভাগ সময় সবাই গরম জামাকাপড়ের মধ্যে থাকে।

রাতে লেপ-কম্বলের ভেতর শুতে হয়। ফলে শরীর গরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও হজমের সমস্যা বাড়ে। তাছাড়া, শীতকালে নানারকম খাবার পাওয়া যায়। ফলে অনেক সময় মশলাদার খাবার খাওয়া হয়ে যায়। তখন সেই খাবার হজম করা মুশকিল হয়ে যায়। এই ধরনের সমস্যা হলে নাক্সভম ৩০ খেতে হবে। যদি পেটে গ্যাসের পরিমাণ বাড়ে সেক্ষেত্রে কার্বোভেজ, পালসেটিলা ৩০ দেওয়া হয়।

চুলের সমস্যা :

শীতকালে চুলের সমস্যা অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি হয়। এই সময়ে খুশকির প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। খুশকি থেকে রক্ষা পেতে চুলে তেল দিতে হবে। যেহেতু এই সময় চুল শুষ্ক হয়ে যায়, তাই তেল দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

শুষ্ক খুশকি হলে মেজোরিনাম ৩০ খেতে হবে। খুশকির সঙ্গে চুলকানোর লক্ষণ থাকলে সালফার খেতে হবে। চুল পড়ার উপসর্গ থাকলে থুজা ৩০ দেওয়া হয়। মাথায় লাগানোর জন্য কোচলিয়ারেবিয়া ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের সমস্যা :

শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে ত্বক ফাটতে শুরু করে। আঙুলের ডগা, পায়ের তলা, যদি প্রবলভাবে ফাটতে শুরু করে, তাহলে পেট্রোলিয়াম ৩০ খেতে হবে। শুষ্ক ত্বক থেকে যদি খোলস উঠতে শুরু করে সেক্ষেত্রে সোরিনাম ২০০ খেতে হবে। তাছাড়া ত্বকে গোল গোল শুষ্ক দাগ হলে ব্যাসিলিয়াম ২০০ খাওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত শুষ্ক ত্বকের জন্য ন্যাট্রাম সিউর ২০০ ভালো কাজ দেয়।

উপরিউক্ত ওষুধগুলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মতে সুন্দর ওষুধ, কিন্তু রোগীর রোগের অবস্থা বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ ও তার শক্তি নির্বাচন করেন যা চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬

সমাবেশ সমাচার

আরোগ্য ভারতীর ‘গর্ভসংস্কার’ আলোচনাসভা

গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ আরোগ্য ভারতীর পরিচালনায় কলকাতায় কেশব ভবনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষয়— উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ‘গর্ভ সংস্কার’। আলোচনাসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চকর্ম বিভাগীয় প্রধান ডাঃ হিতেশ জানি। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সভাপতি রমেশ গৌতম। অখিল ভারতীয় সম্পাদক অশোক বার্ষ্ণেয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সমিতির সদস্য তপন বৈদ্য, দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন আরোগ্য ভারতীর প্রান্তীয় সমিতির সদস্য আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাসভা তিনশোর বেশি নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় স্বস্তিকার প্রচার অভিযান

‘সত্য সংবাদ, নির্ভীক পরিবেশন’ স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু হলো স্বস্তিকার প্রচার অভিযান। গত ১০ ডিসেম্বর কলকাতা উত্তর শহরতলির তাঁতিপাড়া সংলগ্ন কালীতলা মাঠে একটি মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘরে ঘরে স্বস্তিকার প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি হয় জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হয়। ওইদিন স্বাস্থ্য শিবির প্রাঙ্গণে স্বস্তিকা পত্রিকার একটি স্টল করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে আসা মানুষ স্বস্তিকার স্টলে ভিড় জমান। শুধু তাই নয়, মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন স্বস্তিকার প্রচার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত জয়রাম মণ্ডল। তিনি বলেন, ৭০ বছরে পদার্পণ হতে যাওয়া স্বস্তিকা পত্রিকাটি শহর ও শহরতলির সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাই এই প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য। স্বস্তিকা এমন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা যেখানে রাজনৈতিক থেকে সামাজিক, স্বাস্থ্য, মহিলাদের বিশেষ বিভাগ ‘অঙ্গনা’, এমনকী শিশুদের কথা মাথায় রেখে শিক্ষামূলক লেখা ‘নবাঙ্কুর’ বিভাগ রাখা হয়েছে।

শ্রদ্ধা'র ৭৯ ও ৮০ তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

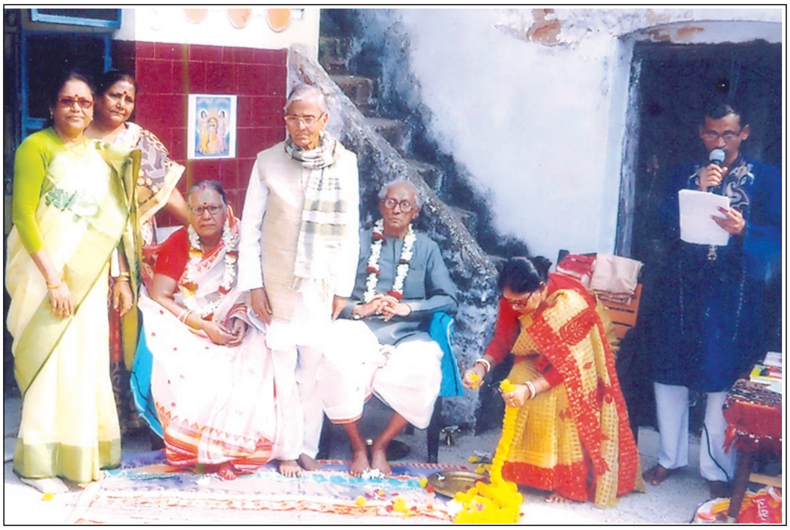

গত ২০ নভেম্বর বীরভূম জেলার কড়িধ্যা গ্রামের দত্ত পরিবারের ৮৮ বছর বয়স্ক নির্মল দত্ত এবং ৮৩ বছর বয়স্কা তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী শিবানী দত্তকে শ্রদ্ধা'র ৭৯ ও ৮০ তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় দত্ত পরিবারের কুলদেবতা শ্রীল মহাপ্রভু মন্দির প্রাঙ্গণে। ওঙ্কার, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি-সহ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। দত্তবাড়ির মেজো বৌমা তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির পা ধুইয়ে চন্দন ও ফুল দিয়ে তাঁদের পাদবন্দনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ২টি মানপত্র পঠিত হয়। ১টি মানপত্র পাঠ করেন লাউজোড় উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অন্যটি পাঠ করেন কুবিলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সুব্রত সিংহ। শ্রীদত্ত ও শ্রীমতী দত্তকে পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, গীতা, ফল-মিষ্টি উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন দত্তদম্পতির পুত্র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রদীপ দত্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিউড়ি জজকোর্টের ব্যবহারজীবী সুভাষ দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিউড়ি বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিকোৎসব

প্রতি বছরের মতো পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের যৌথ উদ্যোগে ৩৭তম বার্ষিক উৎসব গত ১৮ ডিসেম্বর কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সুদূর বনাঞ্চলে থাকা বনবাসী ভাইবোনেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে রত রয়েছে কল্যাণ আশ্রম। শহরবাসী ও বনবাসী-গিরিবাসী ভাই- বোনেদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করাই এই অনুষ্ঠানের মূলভাবনা। সভাপতি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট শিল্পপতি মহেশচন্দ্র শাহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে 'যুগপুরুষ বিবেকানন্দ' নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ কৃষ্ণচন্দ্র মাহাত গত ১১ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। তিনি স্ত্রী ও কন্যা রেখে গেছেন।

বীরভূম জেলার আচার্য-আচার্যা সম্মেলন

গত ১৩ নভেম্বর সরস্বতী শিশু মন্দিরের বীরভূম জেলা সমিতি যোজনায়, জেলার ২০টি শিশু মন্দিরের আচার্য ও আচার্যা সম্মেলন বানীওর সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের সভাপতি গোপাল হালদার প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। জেলার দুশো আচার্য-আচার্যা-সহ জেলা সমিতির সম্পাদক দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ লক্ষ্মণ বিষ্ণু ও পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা বিকাশ ভুঁইয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল, বিভাগ প্রচারক উত্তম মণ্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনে জানা যায় জেলার সব শিশু মন্দিরের মোট শিশুসংখ্যা চার হাজার চারশো পঞ্চাশ জন। সম্মেলনে স্থির হয় ২০১৬ সালের জেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি সিউড়ী শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে রক্তদান শিবির

গত ২০ নভেম্বর বাঁকুড়া জেলার খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সদ্য প্রয়াত শিশু মন্দিরের আচার্য কৃষ্ণ মাহাত স্মরণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় শিশুমন্দির পরিসরে। শিবিরের উদ্বোধন করেন খাতড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী কল্পনা মণ্ডল। আচার্য-আচার্যা-সহ মোট ৩৮ জন রক্ত দান করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২৭ নভেম্বর বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত হাবালা গ্রামের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন মহকুমা কার্যবাহ নিত্যানন্দ হালদার তাঁর একমাত্র পুত্র রাজু হালদারের বধূবরণ অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আই আই টি খড়্গপুরের কৃতীছাত্র রাজু অতিথি অধ্যাপক হিসেবে এখন ইজরায়েলে রয়েছেন। সঙ্ঘের প্রবীণ সঙ্ঘ-প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আই আই টি খড়্গপুরের একাধিক অধ্যাপক এবং সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে ড. অবস্থীর স্মৃতিতে কাব্যগোষ্ঠী সম্পন্ন হয়।

শোকসংবাদ

হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের বাণীয়াড়া গ্রামের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর অমিয় মুখার্জীর স্ত্রী ছবিরানি মুখার্জী গত ১২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৩ পুত্র রেখে গেছেন। তাঁরা সবাই স্বয়ংসেবক।

* * *

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর খণ্ডের নাইকুলি শাখার স্বয়ংসেবক সুচিন্ত্য দে ও অচিন্ত্য দে-র পিতা হারাধন দে গত ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

স্বস্তিকার প্রাক্তন কর্মী প্রদীপ কুমার সান্তারার পিতৃদেব ননীগোপাল সান্তারা গত ১৪ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি স্ত্রী, চার পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ৮ ডিসেম্বর সংস্কার ভারতীর শুভানুধ্যায়ী ড. বুদ্ধদেব আচার্য দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধীনে পুঁথি বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত গবেষক ছিলেন। সংস্কার ভারতী বোলপুর-শান্তিনিকেতন শাখার সব উৎসব অনুষ্ঠানে সাগ্রহে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যা ও স্ত্রী রেখে গেছেন।

* * *

দঃ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাপুটে কার্যকর্তা প্রিয়ংকর চট্টোপাধ্যায় গত ২৫ নভেম্বর নিজগৃহে পরলোকগমন করেন। তিনি যশস্বী ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮৩ সালে একাত্মতা রথযাত্রায় তাঁর ভূমিকা ছিল অসীম। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, নাতনি ও বহু কৃতী ছাত্র রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রয়াত জেলা সঙ্ঘচালক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং প্রখ্যাত নাট্যকার সৌরিন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

বাঙালির এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

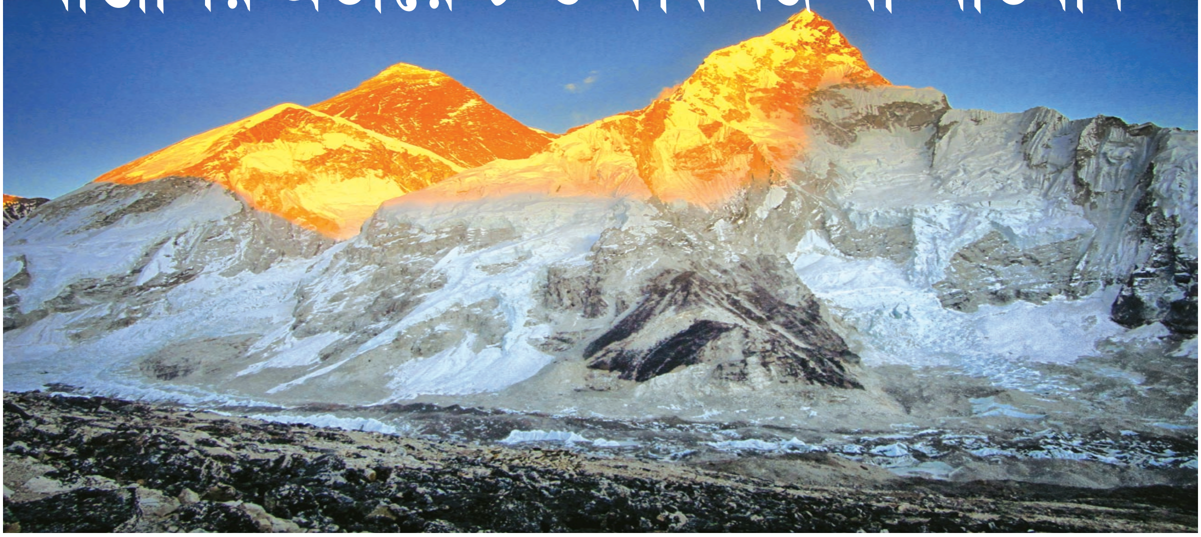

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাউন্ট এভারেস্ট নামটা উচ্চারণ করলেই এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে মনে। একই সঙ্গে আবেগ ও রোম্যান্টিকতা এসে হৃদয় মন্থনও করে। এ যেন এক জাদুবাস্তবতা। অনেকটা বার্গম্যানের ছবির মতো মায়াবী বিভ্রম। তাইতো যুগ যুগ ধরে এভারেস্টের দুর্নিবার আকর্ষণে ঘরছাড়া হয়েছেন কত অভিযাত্রী। বিশ্ববিখ্যাত পর্বত অভিযাত্রী জর্জ ম্যালোর এভারেস্ট জয়ে বারবার ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে গিয়েও আবার নতুন আশায় বুক বেঁধে এবং আরো তৈরি হয়ে ফিরে আসেন জয়ের অভিলাষ নিয়ে। তাঁর মুখনিঃসৃত সেই অমোঘ উক্তি 'আই উইল কাম এগেইন অ্যান্ড এগেইন, বিকজ ইট ইজ দেয়ার'— সর্ব যুগের অভিযাত্রীদের কাছে বেদমন্ত্রের মতো। মহান এই ব্রিটিশ পর্বতারোহীর নেতৃত্বে প্রথম এভারেস্ট অভিযান হয়েছিল ১৯২১ সালে। যথারীতি ব্যর্থ হয়েছিল সেই অভিযান। এরপর প্রায় প্রতি বছরই ব্রিটেন-সহ ইউরোপীয়ান বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা অভিযাত্রিক সংগঠন তা সে সামরিক বা অসামরিক যাই হোক না কেন এভারেস্ট অভিযান চালিয়ে গেছেন কিন্তু বিশ্বের শীর্ষবিন্দু অধরাই থেকে গেছে।

১৯৫৩ সালে কর্নেল জন হান্টের নেতৃত্বে ব্রিটিশ টিমের সদস্য হিসেবে নিউজিল্যান্ডের স্যার এডমন্ড হিলারি ও ভারতের দার্জিলিংয়ের নেপালি শেরপা তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে পদার্পণ করেন। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম চন্দ্রাভিযান বা মঙ্গলগ্রহ অভিযানের থেকেও কঠিন ও স্মরণীয় এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণের এই দুর্লঙ্ঘ্য নজির তথা অনন্য কৃতিত্ব। এরপর দেশি-বিদেশি বহু অভিযাত্রী মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছেন ও নতুন নতুন দিকচিহ্ন রচনা করেছেন। বাঙালি হিসেবে প্রথম এভারেস্ট জয় করেন নৌবাহিনীর কমান্ডার সত্যব্রত দাম, ২০০৪ সালে। তারপর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জয়ের অবিশ্বাস্য কীর্তি স্থাপন করে গিনেস বুক অব রেকর্ডসে নিজের নাম তুলে দেন। কিন্তু সত্যব্রত প্রতিটি অভিযানেই গিয়েছেন সেনা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে। অর্থাৎ এগুলি সামরিক অভিযান যার সঙ্গে বৃহত্তর জাতিসমাজের যোগসূত্র নেই। সেই হিসেবে প্রথম এভারেস্ট জয়ী অসামরিক বাঙালি হলেন বসন্ত সিংহ রায় ও দেবাশিস বিশ্বাস। কৃষ্ণনগর পর্বত অভিযান ক্লাবের দুই কৃতবিদ্য অভিযাত্রী ২০১০ সালের ১৭ মে মাউন্ট এভারেস্টের মাথায় দাঁড়িয়ে বাঙালির বীরত্বব্যঞ্জক বজ্রনির্ঘোষ ছড়িয়ে দিলেন দিগন্তবলয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল বাঙালি তথা ভারতীয়রা জীবনের সবক্ষেত্রে দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুপ্রাচীন সভ্যতার হিরন্ময় উদ্ভাস ছড়িয়ে দেবেন যাতে গোটা বিশ্বসমাজ ভারতের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। (তাইতো তার কথা ছিল এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।) সেই ভারতবর্ষই যে বাঙালির গৌরবগরিমার আধার স্বরূপ। বাঙালির এভারেস্ট জয় তাই সারা দেশকে উদ্বেল করেছে। এরপর দেবাশিস ও বসন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ জয় করেছেন। এভারেস্টের তুলনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় অপেক্ষাকৃত কঠিন।

এভারেস্ট অভিযানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুবিধে প্রদান করে নেপাল কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া পর্বতগাত্র ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি মোটামুটি সুবিধেজনক ও অনুকূল থাকে। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্ষেত্রে যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে থাকে। তাই এই শৃঙ্গ অভিযান খুব একটা বেশি দেখা যায় না।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেই কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান একটু বেশিই মর্যাদা আদায় করে থাকে। তাই দুই বঙ্গসন্তানের কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় আন্তর্জাতিক মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের 'হল অব ফেমে' স্থান পেয়ে গেছেন। তবে শুধুমাত্র এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানেই থেমে থাকেনি তাঁদের সঙ্কল্প। এরপর নেপাল ও ভারতের আরো দুই সাড়ে আট হাজারি শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা ও ধৌলগিরি জয় করে পর্বত অভিযানের হিমালয়ান গ্রান্ডস্লাম করে ফেলেছেন। দেবাশিস কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তার চূড়ান্ত লক্ষ্য 'সেভেন সামিট' সম্পন্ন করা একবারে। অর্থাৎ সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করে বিশ্বশ্রেষ্ঠ পর্বত অভিযাত্রীদের এলিট ক্লাবে ঢুকে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ও দর্শনকে সত্যে পরিণত করা। ■

শব্দরূপ-৮১৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

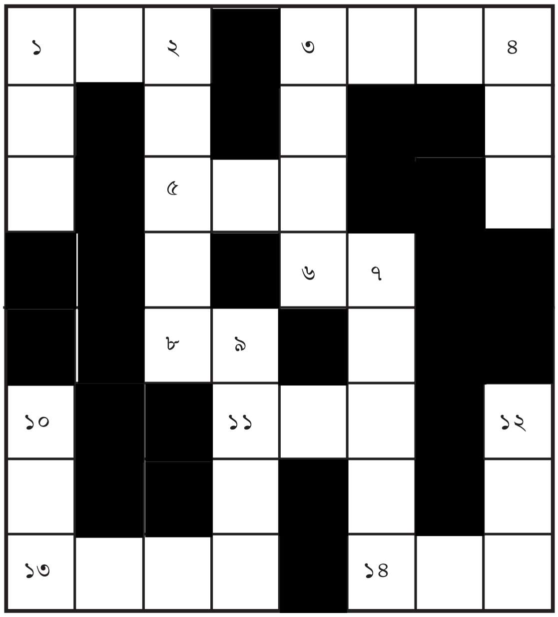

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সম্মান বা পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত পাগড়ি, **৩.** সুকণ্ঠ পাখি, **৫.** রাধিকার সখি, **৬.** রামচন্দ্রের পুত্র, **৮.** 'রঘুপতি রাঘব রাজা—', **১১.** দু'মুখো সোনা, **১৩.** চৈতন্যদেবের ভক্ত অগ্রজতুল্য সহচর বিশেষ, নিতাই, **১৪.** রাধিকার শাশুড়ি।

উপর-নীচ : ১. ব্যাঙের ছাতা, **২.** ''ওগো নদী আপন বেগে —'', **৩.** নৌকার সাহায্যে যে বাণিজ্য করে, **৪.** দুর্যোধনের কন্যা, **৭.** বন্দুকধারী সিপাহি, **৯.** ফুলের মধু, **১০.** মীমাংসাদর্শন প্রণেতা, **১২.** কামরাঙা।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১২

	য	ব	ন	হ	রি	দা	স
ম	ক	র			সা		
গ			ক	ম	লা	কা	ন্ত
জ	ব	র		ল্ল		মা	
	রা		চো		স	ই	স
লৌ	হ	ক	পা	ট			স্ব
		ল্ল			আ	কা	ল
জী	ব	না	ন	ন্দ	দা	শ	

সঠিক উত্তরদাতা

দেবাত্মা মজুমদার
রানিকুঠী,
কলকাতা-৪০
সুনীল বিষ্ণু,
সিউড়ী, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৮১৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

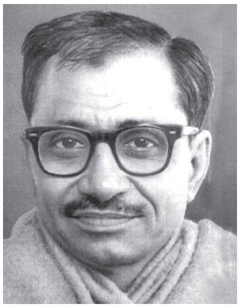

জীবনের বিভিন্ন আদর্শের জন্যই শুধু নয়, দেশ ও কালের বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে আমাদের আর্থিক বিকাশের পন্থা পশ্চিমিদেশের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। আমরা মার্শাল ও মার্কসের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেছি। অর্থশাস্ত্রের যে সমস্ত নিয়ম তাঁরা প্রচলন করেছেন আমরা তাকেই শাশ্বত মেনে চলেছি। এটা ব্যবস্থা নির্ভর, একথা জেনেও তার পরিধি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছি না। পশ্চিমি আর্থিক সমৃদ্ধি তাদের অর্থ উপার্জন করার পদ্ধতির ব্যাপারে আমাদের মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে দিয়েছে। পশ্চিমি অর্থশাস্ত্রজ্ঞগণ এত সুন্দর বিবেচনাসুলভ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন যে তার ভারে আমরা সহজেই নত হয়ে যাচ্ছি। আমরা তার উপরে উঠতে পারছি না। এই সমস্ত অর্থশাস্ত্রে এমন অনেক বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে যা দেশ, কাল নিরপেক্ষ এবং সকলের জন্য উপযোগী, কিন্তু ভাল মন্দের বিচার একজন যোগ্য পরীক্ষকই করতে পারেন। আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা এইরকম পরীক্ষকরা তৈরি করেননি। আমাদের কয়েকজন অর্থনীতিক পশ্চিমি দেশের অর্থশাস্ত্রে উত্তম বিশেষজ্ঞ হতে পারেন— কিন্তু তাতে আমাদের আর্থিক বিকাশে কোনো লাভ হবে না, কারণ ভারতের অর্থব্যবস্থার প্রয়োগও ক্ষেত্র আলাদা।

* * *

আমদানির মাধ্যমে আমরা নিজেদের বাধা বিপত্তি কাটানোর চেষ্টা করি, কিন্তু দেশে এই সমস্যার বাস্তবিক সমাধান কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই হয়। এটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে আমরা এই দিশাতে সন্তোষজনক কাজ করিনি। বর্তমান চুক্তি এই সরকারের বিফলতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। সময়ের তালে আমরা বিদেশি দ্রব্যের উপর উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আমাদের ভয় হয়, বর্তমানে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ার কারণে সরকার দেশে উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়াস শিথিল করে দিতে পারে। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বলেছেন— আমেরিকা জনতান্ত্রিক বিশ্বের সংঘর্ষরত জনতাকে জানাতে চায় ও মেনে চলতে বলে 'স্বাধীনতা এবং ভোজন দুইই একসঙ্গে চলতে পারে'। কিন্তু আমরা চাই— নিজের স্বাধীনতা ও নিজের ভোজন। এটা তখন সম্ভব যখন আমরা 'বিদেশি খাদ্য থেকে মুক্তি' এই পুরনো ধ্বনি পুনরায় উচ্চারণ করব। বিদেশি সহায়তার উপর নির্ভরতা আমাদেরকে দুর্বল, অলস কিংবা বিপদমুখী করে দেবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১৭

জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা, লেখক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করার দায়ে কেরল পুলিশ মালায়ালি লেখক কমল সি চাবারা ওরফে কমলসাই পারনাকে গ্রেপ্তার করেছে। ফেসবুকে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, কোল্লম জেলার করুণাগাপ্পল্লি থানায় দায়ের করা একটি এফ আই আর-এর ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়। পারনা তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস শ্মশানানগালুডে নোত্তুপুস্তকম্ থেকে একটি অংশ ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন। উপন্যাসের এই অংশে একটি স্কুলের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। যে স্কুলে ক্লাস চলাকালীন (বিকেল ৪টে পর্যন্ত) শিক্ষকেরা ছাত্রদের টয়লেটে যেতে দেন না। ক্লাস শেষ হবার পর সবাই মিলে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ছাত্ররা দৌড় দেয় টয়লেটের দিকে। উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য, ওই স্কুলের ছাত্রদের কাছে জাতীয় সঙ্গীতের অর্থ টয়লেটে যাবার অবকাশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় সঙ্গীত চলার সময় উঠে না দাঁড়ানোর জন্য কেরলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও বারোজন অভ্যাগতকে গ্রেপ্তার করেছে কেরল পুলিশ।

জইশের বিরুদ্ধে এনআইএ-র চার্জশিট গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঠানকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার ছাউনিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর অভিযোগে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জইশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করেছে এনআইএ। চার্জশিটে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে জইশের প্রধান মাসুদ আজহার ও তার ভাই রাউফ আসগর-সহ মোট চারজনের। চারজনের বিরুদ্ধেই ইউএপিএ ধারায় নাশকতামূলক কাজকর্ম এবং পরিকল্পিত সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছে এনআইএ। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জইশ-র বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল। এনআইএ-এর সূত্র অনুযায়ী, পাঠানকোট সেনাছাউনিতে দু'দিনের সংঘর্ষে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর গুলিতে যেসব জঙ্গিমারা গিয়েছিল তারা হলো, নাসির হোসেন, হাফিজ আবু বকর, উমর ফারুক এবং আবদুল কায়ুম। তারা যথাক্রমে বেহারি (পঞ্জাব), গুজরানওয়ালা (পঞ্জাব), সংঘর (সিন্ধ) এবং সুক্কুরের (সিন্ধ) বাসিন্দা। পায়ের ছাপ এবং ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলের ডিএনএ পরীক্ষায় নিশ্চিত হবার পর জঙ্গিদের নাম প্রকাশ করা হয়।

মাসুদ আজহার

আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র সবিতা বৈদ্যনাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রভাব পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার কুপার্টিনো শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত সবিতা বৈদ্যনাথন। 'দ্য মার্কারি নিউজ'-এর খবর অনুসারে কুপার্টিনোশহরের

মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হওয়া সবিতা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এমবিএ এবং একটি হাইস্কুলের গণিতে শিক্ষকতা ও একটি ব্যাঙ্কে অফিসার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি গত ১৯ বছর ধরে কুপার্টিনো শহরে বসবাস করছেন। সমাজসেবামূলক কাজকর্মে তাঁর যথেষ্ট নাম রয়েছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
সত্য সংবাদ, নির্ভীক পরিবেশন

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
26 December - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।